বিস্ময়!
সায়েন্স ফিকশন

VISMOY SCIENCE | VISMOY FICTION | VISMOY S. FICTION | MAY 1971 | PRICE Re. 1/-

Published by Sri S. K. Dhar, 136, Raja Rammohon Sarani, Calcutta 9
and Printed from Novelty Ptg. Works, 144/1, Amherst St., Cal-9.

সম্পাদকীয়—

বিস্ময়ের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। তৃতীয় সংখ্যা যন্ত্রস্থ। অনিবার্য কারনে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হতে দেরী হওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তৃতীয় সংখ্যাটি যাতে ঠিক সময় প্রকাশিত হয় সেদিকে আমরা সর্তক দৃষ্টি রাখছি। বিস্ময় প্রকাশিত হবার পরই কেউ করেছেন সমালোচনা। কেউ জানিয়েছেন শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা আমাদের উৎসাহিত করেছে। আর সমালোচনা আমাদের মনে জাগিয়েছে বিস্ময়কে আরো ভালো করে তোলার দৃঢ় সংকল্প।

পাঠকদের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা সত্যজিৎ রায়ের গোলক রহস্য পুণর্মুদ্রন করলাম। আমরা বিশ্বাস করি, পূর্বে যারা গোলক রহস্য পড়েছেন এবারও তারা বিস্ময়ের পাতায় আর একাবার পড়তে বিন্দুমাত্র ক্লেশ অনুভব করবেন না। বরং একই অনুভুতিতে বার বার রোমাঞ্চিত হবেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস 'প্রোজেক্ট ভালকান' একটু জটিল হলেও যারা সায়েন্স ফিকশন পড়তে ভালবাসেন তাদের ভাল লাগবে। এছাড়া বিশু দাশের 'মহাশূন্যের আগন্তুক' সম্বন্ধে বেশ জোর দিয়ে বলা চলে যে প্রত্যেক পাঠকদের মন কেড়ে নেবে। সায়েন্স ফিকশন জগতে বিশু দাস প্রতিষ্টিত লেখক। তার গল্প বলার সহজ সরলভঙ্গি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে তোলে। এছাড়া লোমহর্ষক কাহিনী পড়ে যারা দুঃস্বপ্ন দেখেন না তাদের জন্য রইল 'আন্দিজের অভিশাপ'। 'আন্দিজের অভিশাপের' প্রতিটি ইঞ্চির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে রহস্য রোমাঞ্চের ভয়াল আস্বাদ।

লেখক ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরীর ফিউচারিসটিক গল্প—'শরীরটা মিলিয়ে যাচ্ছে' প্রত্যেক পাঠককে ভাবিত করবে। এছাড়া ডঃ শ্রীধর সেনাপতির সেদিন ভয়ঙ্কর এককথায় চমৎকার গল্প। আগামী সংখ্যা থেকে বিস্ময়ের সংযুক্ত সম্পাদক হিসাবে কাজ চালাবেন অমিতানন্দ দাস।

শ্রীসুজিত ধর

'বিস্ময়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

'বিস্ময়' প্রথম সংখ্যা হাতে এসেছে। একটি নূতন সায়ান্স ফিকশন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে দেখেই যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। আশা করি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু সংখ্যক লেখকরাও আত্মপ্রকাশ করবেন যারা পত্রিকাটিকে মৌলিক বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনায় সমৃদ্ধি করবেন। এছাড়া বিদেশী ভাল লেখাও ত অজস্র রয়েছে; সেগুলোর অনুবাদ ও অনায়াসে ব্যবহার করা চলতে পারে। আমি বিস্ময় পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ইতি

ভবদীয়—**সত্যজিৎ রায়**

দেশ : সায়েন্স ফিকশন নিয়ে ইদানিং বাংলা ভাষার কিছু কিছু লেখক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তবু গত এক দশকে যারা বাংলা ভাষায় মৌলিক বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প লিখে কিছুটা সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন সংখ্যায় তারা খুবই নগান্য। ইদানিং বিজ্ঞানের পাঠক পাঠিকা বাড়লেও, শুধু বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বা সায়েন্স ফিকশনের কাগজ এ ভাষায় নেই বললেও চলে।.....বিস্ময় সায়েন্স ফিকশনের কাগজটি সর্ব সাধারণের কাছে বেশ কিছুটা যে কৌতুহল সৃষ্টি করবে, বলাই বাহুল্য।

অমৃত : সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা 'বিস্ময়ের' আত্মপ্রকাশকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কিছুকাল যাবৎ বেশ বিস্তৃত হচ্ছে। নানা ধরণের বই এবং পত্র পত্রিকা বেরচ্ছে। কিন্তু সায়েন্স ফিকশন পড়বার মত ব্যাপক পাঠক সংখ্যা বাংলা ভাষায় তৈরী হয়েছে কিনা সন্দেহ। এদের উদ্যম নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য।

গোলক রহস্য

সত্যজিৎ রায়

আমার ভেতরের জামাটা ঘামে ভিজে উঠেছে। টেরাটম গ্রহের প্রাণীরা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে—শঙ্কু, কাচের ঢাকনাটা খুলে দাও। আমরা মরতে চলেছি।

●

৭ই এপ্রিল।—

অবিনাশবাবু আজ সকালে এসেছিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'ব্যাপার কী? শরীর খারাপ নাকি? সকালবেলা এইভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না!'

আমি বললুম, 'এর আগে কখনো এইভাবে বসে থাকিনি তাই দেখেন নি।'

'কিন্তু কারণটা কী?'

'একটা নতুন যন্ত্র নিয়ে প্রায় দেড় বছর একটানা কাজ ক'রে কাল সকালে সেটার কাজ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে। তাই ঠিক করেছি সাতদিন বিশ্রাম নেবো।'

অবিনাশবাবু একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাকে পই পই করে বলছি এবার রিটায়ার করুন। আরে মশাই, বিজ্ঞানেরও ত একটা শেষ আছে—নাকি মানুষ অনাদি অনন্তকাল ধরে একটার পর একটা নতুন গবেষণা চালিয়েই যাবে?

আমি একটু হেসে বললাম, 'আমার ত তাই বিশ্বাস। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নেই।'

'মানুষের না থাকলেও, আপনার জিজ্ঞাসার অন্তত সাময়িক বিরতি আছে দেখে খুশি হলুম। চলুন, বেড়িয়ে আসি।'

কাজের সময় অবিনাশবাবু এসে পড়লে রীতিমত ব্যাঘাত হয়। অযথা আজে বাজে প্রশ্ন করেন, টিট্‌কিরি দেন, আর আমার সূক্ষ্ম, গভীর

ছবি : সত্যজিৎ রায়

তাৎপর্যপূর্ণ কাজগুলো পণ্ড করার নানান ছেলেমানুষী চেষ্টা করেন। এতে যে উনি কী আনন্দ পান তা জানি না। তবে ভদ্রলোক আমার প্রায় পঁচিশ বছরের প্রতিবেশী, তাই সবই সহ্য করি।

আজ যখন হাত খালি, তখন কিন্তু অবিনাশবাবুর সঙ্গটা খারাপ নাও লাগতে পারে। হাজার হোক, রসিক লোক! আর আমাকে ঠাট্টা করলেও, আমার অমঙ্গল বাসনা করেন, এমন কখনই মনে হয়নি। তাই অবিনাশবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

গিরিডিতে বেড়াবার কথা বললে উশ্রীর ধারটাই মনে হয়, কিন্তু অবিনাশবাবু দেখি চলেছেন উল্টোদিকে অর্থাৎ তাঁর বাড়ির দিকে। ব্যাপার কী? কী মতলব ভদ্র লোকের?

কিছুদূর যাবার পরে অবিনাশবাবু নিজেই কারণটা বললেন—'আজ একটা খেলনা পেয়েছি। সেটা আপনাকে দেখাবো।'

'খেলনা?'

'চলুন না। দেখলে আপনারও লোভ লাগবে—কিন্তু আপনাকে দেবো না সেটি।'

মনে মনে বললাম—খেলনার বয়স আপনার হয়ত থাকতে পারে—কিন্তু আমার কি আর আছে?

অবিনাশবাবু তাঁর বাড়িতে পৌঁছে সোজা নিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানায়। সেখানে একটা কাঁচের আলমারির সামনে নিয়ে গিয়ে তার দরজাটা খুলে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'দেখুন।'

আলমারির উপরের তাকে দেখি অনেক রকম গ্রাম্য খেলনা সাজানো রয়েছে—কেষ্টনগরের মাটির পুতুল, পোড়ামাটি ও চীনে মাটির জন্তু-জানোয়ার, শোলার গাছ ও পাখি, কাশীর বাঘ ও আরো কত কী! আর এ-সবের মাঝখানে রয়েছে একটি মসৃণ বল। অবিনাশ বাবুর আঙুল সেই বলের দিকেই পয়েন্ট করছে।

'কেমন লাগছে আমার বলটা?'

বলের মতই মসৃণ গোল জিনিসটা—তবে সেটা যে কিসের তৈরি তা বোঝা মুশকিল আর তার রংটার বর্ণনা করা বেশ কঠিন। কিছুটা মেটে, কিছুটা সবুজ, কিছুটা আবার হলুদে আর লাল মেশানো। একটা

পাঁচমিশালি রং বলা যেতে পারে। বেশ মজার লাগল দেখতে বলটাকে।

আমার ইণ্টারেস্ট দেখে অবিনাশবাবুর যেন বেশ খুশি-খুশি ভাব হয়েছে বলে মনে হোল।

জিজ্ঞেস করলাম, এ কোথায় তৈরি? কোত্থেকে পেলেন?

অবিনাশবাবু বললেন, 'প্রথমটির উত্তর জানা নেই। দ্বিতীয়টি খুব সহজ। কাল উশ্রীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি বালির ওপর একটা জলঢোঁড়া সাপ মরে পড়ে আছে। সাপটাকেই দেখছিলুম, হাত খানেক দূরেই যে বলটা পড়ে আছে সেটা প্রথমে লক্ষ্য করিনি। যখন করলুম, তখন এত ভালো লাগল যে তুলে নিয়ে এলুম। একবার হাতে নিয়ে দেখবেন? ওজন আছে বেশ।'

অবিনাশবাবু খুব সাবধানে তাক থেকে বলটা নামিয়ে আমার হাতে দিলেন। সত্যিই বেশ ভারী। আর রীতিমত ঠাণ্ডা। সাইজে একটা টেনিস বলের দ্বিগুণ। কিন্তু হাতে নিয়েও বুঝতে পারলাম না সেটা কিসের তৈরি। মাটির ভাগ হয়ত কিছুটা আছে—কিন্তু তার সঙ্গে বোধ-হয় আরো কিছু মেশানো আছে।

কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে বলটা ফেরৎ দিয়ে বললুম, 'বেশ ইণ্টারেষ্টিং জিনিস।'

অবিনাশবাবু আলমারির ভেতর বলটা রাখতে রাখতে বললেন, 'হুঁ হুঁ! তাহলে স্বীকার করুন যে আপনি ছাড়া অন্য লোকের কাছেও আশ্চর্য জিনিস থাকতে পারে!···যাক্ গে, এবার চলুন সত্যিই একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। বেশ মেঘলা দিনটা করেছে।'

ঘণ্টা দু এক পরে বাড়িতে ফিরে এসে আরেক বার আমার নতুন যন্ত্রটাকে দেখে এলাম। এ-যন্ত্র সম্বন্ধে বাইরে জানাজানি হলে আবার নতুন করে যে সম্মান পাবো সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি—মাইক্রোসোনোগ্রাফ। প্রকৃতির সব সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম শব্দ যা মানুষের কানে আজ অবধি কখনো শোনা যায়নি, এমন কি যার অনেক শব্দের অস্তিত্বই মানুষে জানত না—সেই সব শব্দ এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার শোনা যায়।

কাল পিঁপড়ের ডাক শুনেছি এই যন্ত্রে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

কতকটা ঝিঁঝির ডাকের মতই তবে ওরকম একটানা একঘেঁয়ে নয়। অদ্ভুত বৈচিত্র্য—সুরের ওঠানামা, স্বরের তারতম্য—সব কিছুই আছে ওই পিঁপড়ের ডাকে। আমার ত মনে হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে আমি পিঁপড়ের ভাষাও বুঝতে পারব। আর শুধু পিঁপড়ে কেন? এতে প্রকৃতির এমন কোন সূক্ষ্ম শব্দ নেই যা শোনা যায় না। একটা knob আছে, সেইটে ঘুরিয়ে এর ওয়েভলেংথ পরিবর্তন করা যায়। এবং এই ঘোরানোর ফলেই বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত আওয়াজগুলো ধরা পড়তে থাকে।

আমি বাড়ি ফিরে এসে একটা বিশেষ ওয়েভলেংথে knobটা সেট করে, আমার বারান্দার টবের গোলাপ গাছের একটা ফুল ছিঁড়তেই অতি তীক্ষ্ণ বেহালার স্বরের মত একটা আর্তনাদ আমার যন্ত্রটায় ধরা পড়ল। এটা যে ওই গাছেরই যন্ত্রণার শব্দ সেটা ভাবতেও অবাক লাগে!

অবিনাশবাবু আমাকে তার বল দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার এই যন্ত্রটার বাহাদুরির দু-একটা নমুনা দেখলে না জানি তার মনের অবস্থা কী হবে!

১২ই এপ্রিল।—

আজ সকালে আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফটা দেখানোর জন্য অবিনাশবাবুর কাছে আমার চাকর প্রহ্লাদকে পাঠাবো ভাবছিলাম—এমন সময় দেখি ভদ্রলোক নিজেই এসে হাজির।

তার চোখ মুখের ভাব এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের রকম দেখে মনে হল তিনি বেশ উত্তেজিত। আমি তখন যন্ত্রটা আমার বাগানের ঘাসের ওয়েভলেংথের সঙ্গে মিলিয়ে আমার মালির ঘাস কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের সমবেত চীৎকার শুনেছি। অবিনাশবাবু আমার ল্যাবরেটরীতে ঢুকে হাতের লাঠিটা দড়াম করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে টিনের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লেন। তারপর একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করছেন—আর এদিকে আমার বাড়িতে যে তাজ্জব কাণ্ড চলেছে।'

অবিনাশবাবুর তাচ্ছিল্যের সুরটা মোটেই ভালো লাগল না। গলার স্বরটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'কী কাণ্ড?'

'শুনবেন কী কাণ্ড ? আমার সেই বল—মনে আছে ?'

'আছে।'

'কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং বদলাচ্ছে।'

'কী রকম ?'

'এত ধীরে বদলাচ্ছে, যে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু আপনি যদি এখন দেখে আবার দুঘণ্টা বাদে গিয়ে দেখেন, তাহলে চেঞ্জটা পষ্ট বুঝতে পারবেন। আমি ত নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে কদিন থেকে এই করছি।'

'এখন কি রকম দেখলেন ?'

'এখন ত সকাল। সকালের চেহারা সেদিনের সকালের চেহারার মতই। এখন যদি দেখেন ত সেদিনের মতই দেখবেন। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরে গেলে দেখবেন একেবারে অন্যরকম। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার সুরু হয় সন্ধে থেকে। কি রকম একটা সাদা সাদা ছোপ পড়তে থাকে। পরে মাঝ রাত্তিরে যদি দেখেন ত দেখবেন একেবারে ধপ্‌ধপে সাদা। যেন একটি জায়াণ্ট সাইজ ন্যাফথ্যালিনের বল!'

ভারী আশ্চর্য ত।'

'ভাবছি খবরের কাগজে একটা খবর পাঠিয়ে দিই। তবু এই গোলক-রহস্যের জোরে যদি কিছুটা খ্যাতি হয়। জীবনে ত কিছুই হোল না। চাইকি যাদুঘরের জন্য গভর্ণমেণ্টকে বেচে যদি দুপয়সা করে নেওয়া যায় তাই বা মন্দ কী ?'

অবিনাশবাবুর কথা শুনে বুঝলাম তিনি আকাশ কুসুম দেখছেন। মুখে বললাম, 'এসব করার আগে একবার জিনিসটা নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখলে হত না ? হয়ত দেখবেন চোখের ধাঁধা কিম্বা আপনার দেখার ভুল।'

অবিনাশবাবু এবার যেন রীতিমত রেগে উঠলেন। তড়াক্ করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে লাঠিটা বগলদাবা করে নিয়ে বললেন, 'ভুল ত ভুল। আপনি থাকুন আপনার হাতুড়ে কারবার নিয়ে! আমি দেখি আমার বলের দৌলত কতখানি।'

এর প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক

হনহনিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের দিকে অনুভব করলাম যে বলটা সম্পর্কে আমারও মনের কোণে কেমন যেন একটা কৌতূহল উঁকি দিচ্ছে।

আমার যন্ত্রটা তখন একটু গণ্ডগোল করছে—বোধহয় ভিতরে কোন কনট্যাক্টের গোলমাল হয়ে থাকবে। সেটাকে পরে শোধরাবো স্থির করে অবিনাশবাবুর বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখি ভদ্রলোক তার বৈঠকখানার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে একটা চিঠি লিখছেন। আমায় দেখিয়ে বললেন—'দেখুন ত মশাই ভাষাটা কেমন হয়েছে। এটা আনন্দবাজারকে লিখেছি।—'সবিনয় নিবেদন, আমি সম্প্রতি একটি আশ্চর্য গোলক সংগ্রহ করিয়াছি যাহার তুল্য বস্তু পৃথিবীতে আর আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গোলকটির একাধিক বিস্ময়কর গুণ আছে। যথা, ইহা কোন পদার্থের সংমিশ্রণে নির্মিত তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব (স্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বরবাবু মহাশয়ও এ ব্যাপারে আমার সহিত একমত।) গোলকটির দ্বিতীয় গুণ—ইহার বর্ণ আপনা হইতেই প্রহরে প্রহরে পরিবর্তিত হয়। তৃতীয়ত—'কেমন হচ্ছে?'

'বেশ ত। তৃতীয় গুণটি কী?'

ওইটেই এখন লিখছি। সেটা হল—মাঝে মাঝে বলটাকে ধরলে কেমন ভিজে ভিজে মনে হয়। এখন দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

অবিনাশবাবু চিঠি লেখা বন্ধ করে আমাকে তার আলমারির কাছে নিয়ে গেলেন। এবারে দেখলাম ভদ্রলোককে চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলতে হল। খুলে বললেন, 'হাত দিয়ে দেখুন, ভিজে টের পাবেন! আর ওই দেখুন কেমন সাদার ছোপ ধরতে আরম্ভ করেছে।'

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে বলটা ছুঁতেই আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। আসলে আর কিছুই না—ছুঁয়ে দেখলাম যে বলটা শুধু ভিজে নয়, একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।

অবিনাশবাবু বললেন, 'সেদিনের চেয়ে তফাৎ দেখলেন ত? এবার বলি কি, কিছুক্ষণ আরো থেকে অন্তত আরো কিছুটা পরিবর্তন দেখে যান। আমি ভেতরে বলে দিচ্ছি—আপনার রাত্রের খাওয়াটা

এখানেই সারুন, কেমন ?'

গোলকের রূপান্তর দেখে সত্যিই আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তাই অবিনাশবাবু অনুরোধ না করলে আমি নিজেই হয়ত আরো কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ার প্রস্তাব করতাম।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে বলের রং-পরিবর্তন স্টাডি করে এই কিছুক্ষণ হল বাড়ি ফিরেছি। অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি তখন রাত সাড়ে এগারোটা। বলের চেহারা তখন সত্যিই একটা অতিকায় ন্যাফথ্যলিনের গোলার মত। আমার ইচ্ছে ছিল বলটাকে অন্তত একবার একদিনের জন্য আমার কাছে এনে সেটাকে নিয়ে একটু গবেষণা করি—কিন্তু অবিনাশবাবু নাছোড়বান্দা। আমার উপর টেক্কা দেওয়ার সুযোগ কি সহজে ছাড়েন তিনি। তাঁর বিশ্বাস—গিরিডিতে আমিও থাকি, তিনিও থাকেন ; অথচ আমারই কেবল জগৎজোড়া নাম ডাক হবে, আর তিনি অখ্যাত থেকে যাবেন—এটা ভারী অন্যায়।

কাল একবার দুপুরের দিকে গিয়ে বলের চেহারাটা দেখে আসতে হবে।

১৩ই এপ্রিল।—

পথে এসো বাছাধন !

আজ অবিনাশবাবু একটি গামছায় মুড়ে বলটিকে নিজেই আমার কাছে দিয়ে গেছেন। আপাতত সেটা আমারই ল্যাবরেটরিতে একটা টেবিলের উপর কাঁচের ছাউনির তলায় সযত্নে রাখা রয়েছে। সারাদিন ধরে প্রাণ ভরে এর রং-পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি।

অবিশ্যি অবিনাশবাবু এলেন বেশ নাটকীয় ভাবেই। তিনি যখন গামছার পুঁটলি হাতে আমার বৈঠকখানায় ঢুকলেন, তখন তাঁর মধ্যে গতকালের উৎফুল্লতার লেশমাত্র নেই বরং যে ভাবটা ছিল সেটা তার বিপরীত। যেন তিনি একটা ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছেন এবং তার জন্য তাঁকে একটা বিশেষরকম মানসিক ক্লেশ ও অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

আমি তখন সবে কফি খাওয়া শেষ করেছি। অবিনাশবাবু ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর বলসমেত গামছাটি রেখে ধুতির খুঁটে কপালের ঘাম

মুচ্ছে বললেন, 'না মশাই, আমাদের এসব জিনিস হ্যাণ্ডল করা পোষায় না। এ রইল আপনার কাছে। কলকাতা থেকে সাংবাদিক এলে আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেবো।'

আমি বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কি হল? এক রাতের মধ্যে এমন কী হল যে এত সাধের বলের উপর একেবারে বিতৃষ্ণা এসে গেল?'

'আর বলবেন না মশাই! এ বল অতি সাংঘাতিক বল—একেবারে শয়তান বল। জানেন, আলমারিটার মাথার উপর একটা টিকটিকি ছিল—সকালে দেখি মরে আছে। শুধু তাই নয়—আলমারির ভেতর থেকে ডজন খানেক মরা আরসোলা বেরিয়েছে।'

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'বিনি পয়সায় এমন একটা ইনসেক্টিসাইড পেয়ে গেলেন, আর আপনি তাই নিয়ে আপশোষ করছেন?'

'আরে মশাই, শুধু ইন্‌সেক্ট হলে ত কথাই ছিল না। আমার নিজেরও যে কেমন জানি গা গুলোনো ভাব হচ্ছে।'

'কদিন রাত জেগে বলটার রং বদলানো লক্ষ্য করছিলেন না?'

'তা করেছি।'

'তার মানেই ঘুমের অভাব হয়েছে—তাই নয় কি?'

'তা হয়েছে।'

'তবে? গা-গুলোনোর কারণ ত পরিষ্কার।'

'কী জানি মশাই। হতে পারে। কিন্তু তাও বলছি—এ বল আপনার কাছেই থাক। কেমন জানি উৎসাহ চটে গেছে—বুঝছেন না?'

আমি মনে মনে যা বুঝলাম তা হল এই—অবিনাশবাবু ত বিজ্ঞান মানেন না—তিনি যেটা মানেন সেটা হল কুসংস্কার। বলটার কাছাকাছি কটা পোকামাকড় মরতে দেখেই তার ধারণা হয়েছে যে বলটার মধ্যে বুঝি কোন শয়তানি শক্তি লুকানো আছে।

এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। আমার দিক থেকে দেখলে ঘটনাটা লাভজনকই বটে। তাই আমি দ্বিরুক্তি না করে বলটা রেখেই দিলাম।

এখন রাত সাড়ে বারোটা। সকাল আটটা থেকে কাঁচের ঢাকনার

বাইরে থেকে বলটার রংপরিবর্তন স্টাডি করছি। সকালে মেটে, সবুজ, লাল, আর হল্‌দে রং-এর খেলা। দুপুরের দিকে লাল আর হলদেটা কমে আসে, সবুজটা আরেকটু গাঢ় হয়। বিকেলের দিকে সবুজটা ক্রমশ লাল আর কমলার দিকে যেতে থাকে। তারপর যত সন্ধ্যা হয়—সেটা হয়ে আসে টক্‌টকে লাল—যেন বলটা একটা পাকা আপেল।

সন্ধ্যা সাতটা থেকেই লক্ষ্য করছি বলের সমস্ত রং চলে গিয়ে কেমন যেন—একটা ছাই ছাই রুক্ষ ভাব নেয়। দশটা নাগাদ সেই ছাই রং-এর উপর সাদার ছোপ পড়তে থাকে।

এখন বলটা একেবারে ধপ্‌ধপে ঝক্‌ঝকে সাদা। তারপর তার উপর আমার দেড়শ পাওয়ার ইলেক্‌ট্রিক লাইট পড়ছে যেন তা থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কাঁচের ছাউনির ভেতরে একটা আবছা কুয়াশার মত কী যেন জমা হচ্ছে। বরফ থেকে বাষ্প বেরিয়ে যে রকম হয় কতকটা সেই রকম।

কালকের দিনটাও এর রং পরিবর্তন স্টাডি করে, পরশু বলটাকে আমার টেবিলের উপর ফেলে এর একটা কেমিক্যাল অ্যানালেসিস করার ইচ্ছে।

১৪ই এপ্রিল।

কাল সারারাত নিউটনটা কেঁদেছে। বলটা আনার পর থেকেই লক্ষ্য করছি তার মেজাজটা যেন কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। কাল সারা দিনে অনেকবার দেখেছি সে এক দৃষ্টে বিরক্তভাবে কাঁচের ঢাকনাটার দিকে চেয়ে আছে। কী কারণ কে জানে।

ঘুমের অভাবেই বোধ হয়—আমার মাথাটাও কেমন জানি একটু ধরেছিল। তাই ল্যাবরেটরিতে যাবার আগে আমার তৈরি সেই বড়ির একটা খেয়ে নিলাম। দুশো সাতাত্তর রকমের ব্যারাম সারে আমার তৈরি এই 'অ্যানাইহিলিন' ট্যাবলেটের গুণে।

আজ ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। কতগুলি কাঁচের বৈয়ামের মধ্যে আমার ছোট ছোট পোকামাকড়ের একটা সংগ্রহ ছিল—ইচ্ছে ছিল মাইক্রোসোনোগ্রাফে তাদের ভাষা শুনে রেকর্ড করব। এখন দেখি প্রত্যেক বৈয়ামের প্রত্যেকটি পোকা মৃত অবস্থায়

লেগে আছে।

এটা অবিশ্যি আমার ভুলেই হয়েছে। বলের এই মারাত্মক ক্ষমতার কথা জেনেও সেগুলোকে সরিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। কী আর করি? মরা পোকাগুলোকে ফেলে দিয়ে খালি বৈয়ামগুলো যথাস্থানে রেখে দিলাম।

এবার বলটার দিকে চেয়ে দেখি—গত কদিন সকালে যে রকম রং দেখেছি, আজও ঠিক সেইরকম। রং বদলানোর নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই দেখে আশ্বস্ত হলাম। এ-জিনিসটা বেনিয়মে বা খামখেয়ালি ভাবে হলে গবেষণার খুব মুশকিল হত।

কাঁচের ঢাকনাটার গায়ে বাষ্প জমে কাঁচের সর্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু জলে ভরে গিয়েছিল। আমি তাই ঢাকনাটা তুলে সেটা পরিষ্কার করতে গেছি। এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজার দিক থেকে একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি, নিউটন দরজার চৌকাঠের উপর পিঠ উচিয়ে লেজ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার দৃষ্টি বলের দিকে।

নিউটন যে একটা লম্ফ দেওয়ার আয়োজন করছে সেটা আমি দেখেই বুঝেছিলাম, এবং আমি সেটার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। লাফটা দিতেই আমি বিদ্যুদ্বেগে বলটার সামনে গিয়ে খপ্ করে দুহাতে বেড়ালটাকে ধরে নিলাম। তারপর তাকে ল্যাবরেটরির বাইরে বার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

বাকি যেটুকু সময় ল্যাবরেটরিতে ছিলাম, দরজায় নিউটনের আঁচড়ের শব্দ পেয়েছি। সামান্য একটা মাটির বলের উপর বেড়ালের এ-আক্রোশ ভারি রহস্যজনক।

আজ সারাদিন আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফ চালিয়ে নানান সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শব্দের চার্ট করেছি, আর সে সমস্ত শব্দই আমার টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করেছি। এই শব্দ সংগ্রহ শেষ হলে পর, শব্দের মানে করার পর্ব শুরু হবে। অবিনাশ বাবু বলছিলেন, বিজ্ঞানের নাকি একটা সীমা আছে। হায়রে! কত যে জানবার বিষয় এখনও পড়ে আছে জগতে, অবিনাশবাবু তার কী বুঝবেন?

এখন রাত একটা। এবারে ঘুমোতে যাব! কিছুক্ষণ থেকেই

যন্ত্রটার কথা ছেড়ে বার বার বলটার কথা মনে হচ্ছে।

ওই যে রং পরিবর্তনের ব্যাপারটা—ওটার মধ্যে কিসের জানি একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কিসের সঙ্গে যেন ওর একটা সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্যটা যেন আমার ধরতে পারা উচিত, কিন্তু আমি পারছিনা। সাদা অবস্থায় বলটা যদি বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তাহলে অন্য অবস্থাগুলো কী? সবুজ, লাল, হলদে, কমলা—এগুলো তাহলে কিসের রং? এই রং পরিবর্তনের কারণ কী? আমিই যদি না বুঝলাম তাহলে বুঝবে কে?

হয়ত কাল থেকে গবেষণার কাজ শুরু করলে ওর রহস্য ধরা পড়বে। হয়ত ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত সহজ। ক্রমাগত জটিল জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালে, অনেক সময় সহজ সমস্যার সামনে পড়ে মানুষের কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার মত বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও এটা অসম্ভব নয়।

যাক্ গে। আজ আর ভাবব না। কাল দেখা যাবে।

১৫ই এপ্রিল—

আমার জীবনে যত বিচিত্র, বীভৎস, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটছে, অন্য বৈজ্ঞানিকের জীবনে তেমন ঘটেছে কি? জানিনা। এক এক সময় মনে হয় আমি সাহিত্যিক হলে এসব ঘটনা আরো সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হয়, যে অত গুছিয়ে লেখার দরকার কী? আমি ত আর বানানো কাল্পনিক ঘটনা লিখছিনা—আমি লিখছি ডায়রি। সোজা কথায় সরল ভাবে আমার জীবনে যা ঘটেছে তাই লিখছি। সেখানে অত ভাষার বাহারের প্রয়োজন আছে কী?

যাই হোক এবার যথাসম্ভব পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা মাথায় এই কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাটা লেখার চেষ্টা করা যাক্।

কাল রাত্রে ডায়রী লেখা শেষ করে বিছানায় শুয়ে আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমি কাল লিখেছিলাম, যে এই রং বদলানোর ব্যাপারটা মধ্যে বিশেষ যেন একটা ইঙ্গিত ছিল যেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে ওটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে একটা আলো দেখতে পেলাম। পরপর রঙের পরিবর্তনগুলো আরেকবার ঝালিয়ে নিলাম মনের মধ্যে। মাঝ রাত্তিরে বলটা সাদা তারপর সকালের দিকে ক্রমে সাদাটা চলে দিয়ে হলুদে লাল

সবুজ ইত্যাদি বেশ একটা জমকালো রঙের খেলা শুরু হয়। দুপুর যত এগিয়ে আসে তত সবুজটা গাঢ় হতে থাকে, হল্‌দে লাল ইত্যাদি উজ্জ্বল রংগুলো কমে গিয়ে বলটা ক্রমশ একটা গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ চেহারা নেয়। তারপর বিকেলের দিকে সবুজ জায়গাগুলো আস্তে আস্তে লাল খয়েরী মেশানো একটা অবস্থায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত সন্ধের দিকে একটা ছাই-ছাই ভাব, এবং রাত বাড়লে পর সাদার ছোপ ধরা শুরু।

কিসের সঙ্গে মিল এই পরিবর্তনের ?

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে—বৈঠকখানার দেওয়ালের ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তরটা হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মত আমার মাথায় এসে গেলো।

আমাদের পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই বলের রং পরিবর্তনের আশ্চর্য মিল।

তফাৎ কেবল এই, যে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটতে একবছর লাগছে—এই বলের সেটা ঘটতে লাগছে এক দিন, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। রাত বারোটায় এই বলের চরম শীতের অবস্থা, যখন এর সবটাই বরফের আবরণে ঢাকা। তারপর সেটা কমে গিয়ে সূর্যোদয়ের সময় থেকে লাল হলদে সবুজের খেলায় এর বসন্তকাল। সূর্য যতই মাথার উপরে উঠতে থাকে এই বল ততই গ্রীষ্মের দিকে এগোয়, রঙের বাহারও কমে আসে। গ্রীষ্মের পর বিকেলের দিকে বর্ষা এলে বলটায় হাত দিলে ভিজে ভিজে ঠেকে। সূর্যাস্তর সময় থেকে এর শরৎ ; সন্ধ্যা বাড়লে প্রথম সাদার ছোপে হেমন্তকাল এবং সেই সাদা বেড়ে গিয়ে মাঝরাত্রে রাত বারোটাতে আবার চরম শীতের অবস্থা।

এই বলটি কি তাহলে আমাদের পৃথিবীরই একটা খুদে সংস্করণ ?

নাকি, এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রহ—সেখানে ঋতু পরিবর্তন আছে, প্রাণ আছে, প্রাণী আছে ?

আমি জানি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসম্ভব বলে প্রায় কিছুই নেই—কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র গ্রহের কথা যে আমি পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি !

আমার চিন্তাধারা হয়ত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলত—কিন্তু একটা অদ্ভুত শব্দের ফলে তার গতি ব্যাহত হল।

(৮৫ পাতায় দেখুন)

মহাশূন্যের আগন্তুক

বিশু দাস

★

ঝন্ ঝন্ শব্দে চম্‌কে উঠলাম। দেখি, সাতকোটি বছর আগের তারার মানুষটি মাতালের মত অপ্রকৃতিস্থ ভাবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আমার এই চিঠির সঙ্গে অধ্যাপক ফেডিনস্কি (Prof Fedynsky)র চিঠিটাও পাঠাচ্ছি। আপনাদের পত্রিকার পাঠকদের যদি ভাল লাগে তো ছাপতে পারেন। এটা পাবার আগের ঘটনা সংক্ষেপে বলে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে কিভাবে এই চিঠিটা আমার হাতে আসে। বাহুল্য মনে করলে বাদ দিতে পারেন এই অংশটা।

অধ্যাপক ফেডিনস্কি যখন প্রথম কলকাতায় আসেন, তখনই আলাপ হয় তাঁর সঙ্গে। মহাকাশবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক বক্তৃতা শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, অযাচিতভাবে আলাপ না করে থাকতে পারি নি। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই থেকেই নিয়মিত চিঠির আদান প্রদান চলে আসছে কয়েক বছর ধরে। অধ্যাপক আমাকে স্নেহ করেন, তাই ব্যস্ততার মধ্যেও চিঠি লেখার সময়টুকু ঠিক বের করে নেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। এবার বেশ কিছুদিন পর চিঠি পেলাম তাঁর কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, “প্রিয় দাস, তুমি আইভ্যান ইয়েফ্রেমভের ‘Steller Ship’ বইটা পড়েছ? যদি পড়ে থাক তোমার মতামত আমাকে তাড়াতাড়ি জানাও...।” বাকিটুকু গতানুগতিক লেখায় ভরা। অবাক হলাম। হঠাৎ অধ্যাপক মহাশয় ওই বইটার কথা কেন লিখলেন বুঝলাম না।

যাই হোক, উত্তরে লিখেছিলাম, “আপনি যে বইটার কথা লিখেছেন সেটা সম্প্রতি পড়েছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না ওটার মধ্যে এমন কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে আপনি এ সম্বন্ধে এত আগ্রহশীল? ওটা তো এক কাল্পনিক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সাত কোটি বছর আগে কোন ছায়াপথ, না তারা থেকে মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে—একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়...। দিন দশেকের মধ্যেই রেজিষ্ট্রী ডাকে উত্তর এসে হাজির। খামটা খুলে গোড়ায় হতাশই হলাম। একটা লম্বা চিঠি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন কি আর জানতাম যে অধ্যাপক আমাকে কি এক অমূল্য তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে মাত্র চারজন তা জানতো। আমি সেই সৌভাগ্যবানেদের একজন। অধ্যাপকের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম বলে এতদিন কিছু প্রকাশ করি নি। মাত্র মাসদুয়েক আগে তিনি মারা গেছেন, সুতরাং এখন আর সেই চিঠি প্রকাশ করতে কোনো আপত্তি নেই। আপনি চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন—কেন অধ্যাপক ফেডিনস্কি এতো যত্ন করে সেটা পাঠিয়েছিলেন। নমস্কারান্তে,—

ইতি,

'অধ্যাপক ফেডিনস্কির চিঠি'

MOKBA

U. S. S. R.

7th March 1969

প্রিয় দাস,

...সাত কোটি বছর আগের 'তারার মানুষ'দের পৃথিবীতে আগমন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে তোমার চিঠিতে। আমি এটাই আশা করেছিলাম তোমার কাছ থেকে। শুধু তুমি কেন, প্রতি দশ হাজার জনের একজনও একথা বিশ্বাস করবে না। বইটাতে পড়েছ যে তারার মানুষের একটা করোটি বা মাথার খুলি পাওয়া গেছিল। কিন্তু তারপর আমি পেয়েছি একটু বেশী। একটা আস্ত দেহ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পেয়েছি। অবশ্য এর জন্য আমাকে বহুদিন একা একা ঘুরতে হয়েছে সেই অঞ্চলে যেখানে প্রথম করোটিটির সন্ধান মেলে। খুব গোপনে সেটা নিয়ে এসেছি। বহুদিন মেতে ছিলাম সব ভুলে। আশা ছিল, এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারবো যা মানুষ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু কিছুই হল না—এতদিনের সাধনা আমার বিফল হয়ে গেল। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মৃতদেহটা যত্ন করে তুলে রেখে দিলাম।

কিছুদিন আগে ইজভেস্তিয়া পত্রিকায় একটা খবর দেখে মনটা নেচে উঠলো আনন্দে। নূতন করে আশার আলো দেখতে পেলাম। কোনো এক রুশ প্রাণী বিজ্ঞানী ও একজন ডাক্তার নাকি পাঁচকোটি বছর আগেকার মৃতপ্রাণীর দেহে প্রাণসঞ্চার করতে সমর্থ্য হয়েছেন। তোমাদের দেশের কাগজেও এ খবর বেরিয়েছে হয়তো। পাঁচ কোটি বছর আগেকার মৃতদেহে যদি প্রাণসঞ্চার করা যায়, তবে সাত কোটি বছর আগের মানুষ-টার দেহই বা পুনর্জীবিত করা যাবে না কেন? তুমি তো জানো, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েই আমার কাজ। ডাক্তারী শাস্ত্রে কতটুকুই বা জ্ঞান। মহাকাশযাত্রীদের দেহের সম্ভাব্য পরিবর্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে যা সামান্য একটু জানি—তার বেশী কিন্তু নয়। মৃতদেহকে বাঁচানো, আমার কল্পনাতীত। ব্যাপারটা এতদিন কাউকে বলি নি, সযত্নে চেপে রেখেছিলাম। কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকা চলে না। এ সুযোগ হয়তো আর কোনোদিনই

পাব না। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে সেই প্রাণীবিজ্ঞানী ও ডাক্তারকে সব কথা খুলে বললাম। কারণ তাঁদের সাহায্য ছাড়া তো কিছুই করতে পারবো না আমি। ওই দু'জনের নাম বিশেষ কারণে তোমাকে এখন জানাতে পারছি না। তবে ধরে নেওয়া যাক প্রাণীবিজ্ঞানীর নাম অধ্যাপক মেজেনসভ্ ও ডাক্তারের নাম ডাঃ রিউমার। পরে তোমাকে সব কিছুই জানাবো। ওদের দুজনকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলাম যে আমরা তিনজন ছাড়া চতুর্থ কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে আমাদের প্রচেষ্টার কথা। তাঁরা রাজী হয়ে গেলেন।

আরম্ভ হলো কাজ। আমারই বাড়ীর পাশাপাশি ঘরে এলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা আধুনিক যন্ত্র। কতকগুলো নাম আমি এখনো উচ্চারণই করতে পারি না। যে উপায়ে তাঁরা প্রাচীন প্রাণী দেহে প্রাণ-সঞ্চার করেছিলেন ইতিপূর্বে, সেই পদ্ধতিতেই পরীক্ষা চললো। তোমাকে তো আগেই বলছি যে ঐ মানুষটার দেহটা প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই পেয়েছিলাম। বরফজমা মাটিতে প্রায় কিছুই নষ্ট হয় নি। তাছাড়া ওর দেহে যে Space Suit জাতীয় পোষাক ছিল, সেটা এমন জিনিষ দিয়ে তৈরী যে সাত কোটি বছরের মত দীর্ঘ সময় তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে নি। আমি এ্যাসিড দিয়ে, আগুন লাগিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখছি—কিছুতেই এতটুকু বিকৃত হয়নি। কি দিয়ে যে তৈরী তাও বুঝতে পারি নি। অথচ আমরা বড়াই করি, আমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির। সাত কোটি আগের মানুষ যা তৈরী করেছিল, আমরা তা মোটেই বুঝতে পারি নি সেটা কি দিয়ে তৈরী!

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। আমাদের তিনজনের জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। টেবিলের ওপর শোয়ানো রয়েছে সেই দেহটা আর আমরা তিনজন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, এই বুঝি নড়ে উঠলো। লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। ইতিমধ্যে কটা দিন আর কটা রাত যে কেটে গিয়েছে ভুলেই গেছি। ওরা দুজন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সম্ভাব্য যত রকম বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, সবই প্রায় প্রয়োগ করা হয়ে গেছে—কিন্তু কিছুই হয়নি। সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষটির নিদ্রাভঙ্গ করে তাকে জাগাতে আমরা পারি নি।

এতদিনের পুরোনো হওয়ায় সেই মানুষটির চামড়াটা শুকিয়ে পাঁপড় ভাজার মত হয়ে গিয়েছে। তাই সারা দেহটায় সিলিকোণ রবারের একটা আবরণ দিয়ে নিয়েছি। কয়েকটি জায়গায় আবরণ ভেদ করে ঢোকানো রয়েছে নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের তার ও সরু মোটা কয়েকটি পলিথিন টিউব।

মানুষটার চেহারা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি এতক্ষণ। লম্বায় একজন সাধারণ মানুষের প্রায় তিনভাগের দু'ভাগ। শরীরটা অত্যন্ত শীর্ণ। শরীরের তুলনায় মাথাটা বেশ বড়, মাথায় চুলের কোনো চিহ্নই নেই। মনে হয় যেন বিরাট এক চকচকে টাক। হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা, আবার পাগুলো বেখাপ্পা রকমের ছোটো। দেখলে মনে হয় মানুষটা পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়াতেই পারবে না। চোখ দুটো বড় বড়, নাকটা একটু চেপ্টা। মুখটা খুব ছোট। এ সবেরই একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আমরা তৈরী করেছি। সে সব পরে তোমাকে জানাবো।

হ্যাঁ, যেকথা বলছিলাম। বহুদিন ধরে চেষ্টা করেও কোনো ফল হচ্ছে না দেখে স্বভাবতঃই বেশ হতাশ হয়ে পড়েছি তখন। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বৃথা নিজেও খেটে মরছি, আর দুটো লোককেও খাটাচ্ছি। এত-গুলো দিন অকারণে নষ্ট করে দিলাম ওদের, ভেবে দুঃখ পেলাম। শেষে একদিন বললাম "আপনারা আর মিছিমিছি আমার জন্য কষ্ট করবেন কেন। অনেক কষ্ট দিয়েছি, এবার আপনাদের মুক্তি দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। যে অমূল্য সাহায্য আপনাদের কাছ থেকে পেলাম, তার দাম আমি কোন-দিনই দিতে পারবো না।" আমার কথা শুনে ওঁরা দুজনেই অবাক। তারপর বললেন "আপনিই বরং এমন একটা জিনিষ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন যা আমরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি। আমাদেরই তো বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার কাছে। আর্থিক ক্ষতি হয়তো সামান্য কিছু হয়েছে—কিন্তু যে জ্ঞানটুকু লাভ করলাম, তার দাম দেওয়া যায় না।"

এরপর বলার আর কিছু রইলো না। কাজ চলতে লাগল মন্থর গতিতে। সবাই ক্লান্ত, নিঃশেষিত। একদিন আমি আর প্রফেসর মেজেনসভ্ বাইরের ঘরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ডুবে রয়েছি গভীর চিন্তায়। চা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে বহুক্ষণ। নিজেদের অস্তিত্বের কথাই

যেন ভুলে গেছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম ডাঃ রিউমারের দৌড়ানোর শব্দে। ল্যাবরেটরী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। মাথার চুল উস্কো খুস্কো, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্তের মত। তাড়াতাড়িতে দরজা খুলতে না পেরে মাথায় ধাক্কা লাগিয়েছেন বোধ হয়—কপালের খানিকটা কেটে রক্ত পড়ছে। আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে চুপ করে হাঁপাতে লাগলেন। বুঝলাম কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না – ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। আমি তাঁর কাঁধটা চেপে ধরে জোরে ঝাঁকানি দিলাম। এবার প্রকৃতিস্থ হয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি—"নড়ছে সাত কোটি বছর আগেকার তারার মানুষ নড়ছে...।" আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বোধহয় তিনি। কিন্তু আমরা কিছু না শুনেই ছুটলাম ল্যাবরেটরীতে। এসে যা দেখলাম তাতেই চক্ষুস্থির। নেহাৎ হার্ট শক্ত নাহলে কখন হার্টফেল করে বসতাম তার ঠিক নেই।

মানুষটার দু'পাশে ঝোলানো হাতদুটো উঠে এসেছে মাথা বরাবর। আমি একছুটে গিয়ে ম্যুভি ক্যামেরাটা নিয়ে এলাম। গোড়া থেকেই ছবিগুলো তুলে রাখতে হবে। ঠোঁট দুটো একটু কাঁপছে। একি, চোখ খুলছে মনে হয়। না কি ওটা আমার চোখের ধাঁধাঁ? কিন্তু বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না, এবার ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালো সেই সেই মানুষটি, সাত কোটি বছর আগে যার মৃত্যু ঘটেছে! চোখদুটো ঘরের চারদিকে বুলিয়ে নিল সে। মনে হল সব জিনিষপত্রগুলি একবার দেখে নিচ্ছে বুঝি। ডাঃ রিউমার কাছে গিয়ে হাতের ঈশারায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে বুঝলো বলে মনে হল না। আমিই যেন আর বর্তমানে নেই, চলে গেছি সাত কোটি বছর আগের পৃথিবীতে, যখন ওরা এসেছিল আমাদের গ্রহে। মানুষ তো দূরে থাক পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবই তখন বিরল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছি না। এও কি সম্ভব যে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা নেই সে জীবন্ত হয়ে বসে রয়েছে আমার সামনে! কত রকমের ভাবান্তর ঘটে গেল মনে সেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার ঠিক নেই।

হঠাৎ চমকে উঠলাম ঝন ঝন শব্দে। চেয়ে দেখি মহাশূন্যের মানুষটি মাতালের মত অপ্রকৃতিস্থভাবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে আর তারই

ধাক্কায় পাশের টেবিলে রাখা একটা কাঁচের যন্ত্র মেঝেতে পড়ে খান খান হয়ে গেছে। ডাক্তার তাড়তাড়ি এসে অতি সাবধানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু সে আবার বসে পড়ল, নিশ্চয়ই খুব দুর্বল লাগছে ওর।

ওরা কোন গ্রহ থেকে এসেছিল, কেন এসেছিল ওদের কতটা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছিল, সব জানবার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছি। কিন্তু উপায় নেই। সে কিছু বলতেও পারছে না বা বুঝতেও পারছে না। হঠাৎ কি করে বুদ্ধিটা মাথায় খেলে গেল কে জানে। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিলাম যখন কোনো মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীতে পাড়ি দিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই মহাকাশবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান এর আছেই। ছুটলাম যাদুঘরে, সেখানকার কিউরেটর আমার বন্ধু। তাকে বললাম, "তোমার এখান থেকে কিছু প্রাচীন উল্কাপিণ্ড কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে ধার দিতে হবে। খুব প্রাচীন জিনিষ দরকার—সাত কোটি বছর, বা তার চেয়েও পুরাণো জিনিষ।" আমার ব্যস্ততা দেখে আশ্চর্য্য হল সে, কারণ আমি যে ধীরে সুস্থে সব কাজ করি পরিচিত মহলে সবাই জানেন। আজ হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন দেখে অবাক হবারই কথা। সে বললো···"দেখ এগুলো সরকারী জিনিষ, তুমি তো জানো এগুলো ধার দেওয়া একেবারেই নিয়ম-বিরুদ্ধ। তবে তোমার ব্যাপার দেখে বুঝতে পারছি কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যই এগুলোকে দরকার।"

আনমনে মাথা নেড়ে সায় দিলাম তার কথায়। মন আমার পড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরীতে।

যাই হোক, তুমি যখন বলছো তখন দিচ্ছি। আজ মিউজিয়াম বন্ধ করার সময়ও তো প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু কাল সকালে মিউজিয়াম খোলার আগে কিন্তু ওগুলো চাই-ই চাই। সমস্তটাই আমার নিজের রিস্ক, মনে থাকে যেন।

পরের দিন সকালের মধ্যেই দেবার শর্তে কতকগুলি উল্কাপিণ্ড নিয়ে এলাম। প্রত্যেকটার গায়ে লেবেল আঁটা—তাতে লেখা কোনটা কোথায় পাওয়া গিয়েছিল, কতদিন আগের, তাতে কি কি রাসায়নিক পদার্থ আছে, ইত্যাদি। সেগুলো এনে পর পর এক লাইনে সাজিয়ে দিলাম একটা টেবিলের উপর। তা রপর টেবিলটা টেনে আনলাম মহাশূন্যের মানুষটির

সামনে। হাতের ইশারায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমরা জানতে চাই সে কোন গ্রহ থেকে সে এসেছে। প্রথমে পাথরের মত নিশ্চল দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, কিছু বুঝলো বলে মনে হল না। কয়েকবার ইশারা করার পর বুঝি বুঝলো সে। চোখ নামিয়ে উল্কাপিণ্ড-গুলির দিকে তাকিয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ। আনন্দের আতিশয্যে পাগুলো আমার ঠক ঠক করে কাঁপছে তখন। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না আর। ডাঃ মেজেনসভ ধরে না ফেললে বোধহয় পড়েই যেতাম।

একি, তার ডান হাতটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে উল্কাপিণ্ডগুলোর দিকে। স্বপ্ন দেখছি না তো! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে আছি। লম্বা আঙুল দিয়ে একটা উল্কাপিণ্ডকে একটু ঠেলে দিল সামনের দিকে। তারপর হাতটা আবার ধীরে ধীরে ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

তারপরই কি হল জানি না। হঠাৎ সে ছটফট করতে শুরু করলো। তাড়াতাড়ি সবাই মিলে ধরে শুইয়ে দিলাম। ওর চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার তাড়াহুড়ো করে তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করার যন্ত্রটাকে টেনে আনলেন পাশের টেবিলটায়। উল্কাপিণ্ডগুলোকে হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে টেবিলটা পরিষ্কার করে নিলেন তিনি। আবার চলল প্রাণ সঞ্চারের প্রচেষ্টা। আমরা তিনজনেই ঝুঁকে রইলাম দেহটার উপর। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি এই বুঝি অজানা বন্ধুটির দেহে প্রাণ স্পন্দন জাগলো! এই বুঝি চোখ খুললো। কিন্তু না—কিছুই হল না। আমরা হেরে গেলাম। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ওভাবে ঝুঁকে টেবিলের চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শেষে কোমর আর সোজা করতে পারি না। এত আশা, এত কল্পনা সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো—সে আর জাগলো না। এদিকে ঠেলে ফেলায় উল্কাপিণ্ডগুলো সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। কোনটা সে বেছে আলাদা করে দিয়েছিল আর খুঁজে পেলাম না। নিজের অজান্তেই একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

তারপর অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাকে আর জাগাতে পারি নি। এবার সে ঘুমিয়েছে, চিরকালের মত। সাত কোটি বছর পরে সে কয়েক ঘণ্টার জন্য দেখে গেল সেদিনের পৃথিবী আর আজকের পৃথিবীর মধ্যে কত তফাৎ হয়ে গেছে।

ডাক্তার এখনও আশা ছাড়েন নি। বলছেন আবার প্রথম থেকে চেষ্টা করবেন তিনি। কিন্তু আমার মনে হয় ওতে কিছু হবে না। তবু দেখি, চেষ্টা করে দেখা যাক। মৃতদেহটা রেখে দিয়েছি যত্ন করে। ব্যাপারটা কাউকে জানাই নি আজও। আমরা তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া তুমিই চতুর্থজন যে এ ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারলে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইলো যে আমি না বললে আমার মৃত্যুর আগের পর্য্যন্ত এ কথা কারুর কাছে প্রকাশ করো না।

কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে যাবার কথা। কলকাতায় সায়েন্স কলেজে দুটো লেকচার দিতে হবে। সেই সময়ে ফিল্মটা তোমাকে দেখাবো। জীবনে আর কোনো মানুষ এ সুযোগ পাবে না। এই কটা দিন ধৈর্য্য ধরে থাকো। আশা করি ভালই আছো।

ইতি, তোমার শুভার্থী

উপসংহার ঃ—

[মাস দুয়েক আগে অধ্যাপক ফেডিনস্কি পৃথিবী থকে বিদায় নিয়েছেন। কি জানি সেই তারার মানুষের সঙ্গে এতদিনে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা। এখন আর কোনো বাধা নেই, তাই এটা প্রকাশ করার জন্য দিলাম। জানি না অধ্যাপক মেজেনসভ ও ডাঃ রিউমার তারার মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আজও রাতের পর রাত তার মৃতদেহটা সামনে নিয়ে বসে থাকেন কিনা।]

একটি রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প

আন্দিজের অভিশাপ

রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

॥ পটভূমি : দক্ষিণ আমেরিকা। সময় : ১৯৯৩ সনের প্রত্যন্ত সীমা। ॥

(আমাদের এ কাহিনীর যখন শুরু ঠিক তার সপ্তাহখানেক আগে, ব্রেজিলের মালভূমি 'মাটোগ্রোসো'র একেবারে উত্তরে, ভয়াবহ খরস্রোতা টাপাজোজ নদীর উপত্যকার এক দুর্গম পাহাড়ের উপরে খনিজ পদার্থ সন্ধানী এক অভিযাত্রীদল রাত্রির আকাশে একটি অদ্ভুত বস্তু লক্ষ্য করেন। ধূমকেতুর মতন পুচ্ছবিশিষ্ট একটা বিশাল আকৃতির অগ্নিগোলক যেন দুরন্ত বেগে মহাশূন্য থেকে নেমে এসে তারপর উত্তর-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য করে যেন ইকুয়েডর রাজ্যের আকাশের পানে ধেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অভিযাত্রীদল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। প্রায় এক শতাব্দী আগে, সাইবেরিয়ায় যে একবার প্রচণ্ড উল্কাপাত হয়েছিল—তাঁরা সে কাহিনী জানতেন। সেই সময়ে পৃথিবীর লোকেরা মনে করেছিল, পৃথিবীটা বোধহয় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু টাপাজোজ নদীর আকাশ দিয়ে যে বস্তুটা ছুটে গেছে সেটা যে উল্কা নয় সেটা বোঝা গেল কয়েকদিন পরেই। বিখ্যাত সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফিওডোর সকলভস্কি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন ওখটস্ক-এর পূর্বপ্রান্তে এক বিশাল 'মানমন্দির' থেকে। তিনি পৃথিবীর সবাইকে চমকিত করে দিয়ে এক বেতার ঘোষণায় বললেন যে, ওটা সৌরজগতের কোন গ্রহপ্রাণী, সম্ভবতঃ মঙ্গল থেকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে এসে পড়েছে! আর গ্রহপ্রাণীটা আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে পেরু আর ইকোয়েডর রাষ্ট্রের প্রান্তসীমা দুর্গম আন্দিজ পর্বতের চূড়োয়।

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ দিয়ে দেখালেন, কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ মঙ্গলের আবহাওয়ায় বিষবাষ্প সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে। কারণ, অতিকায় টেলিস্কোপ-গুলিতে মঙ্গলের একাংশের রঙ কমলা রঙের বদলে তীব্র বেগুনী রঙের দেখাচ্ছে। হিসেব কষে দেখানো হল, মঙ্গল তার সূর্য পরিক্রমার পথে পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে অতিক্রম করবার সময়ে, ১৯৬৬ সালের এই প্রত্যন্ত

সীমায় এসে, ভ্যান অ্যালেন বলয়ের তীব্র তেজস্ক্রিয়তা খানিকটা তার দেহ শুষে নিয়ে যায়। ওই প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা আর সম্ভবতঃ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের হঠাৎ আবির্ভাবে মঙ্গলের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে ওঠায় ওই অজ্ঞাত প্রাণীগুলো মহাশূন্যের পথে পাড়ি দিয়েছে। তারই একটিকে দেখা গিয়েছে ব্রেজিলের আকাশে হঠাৎ ধূমকেতুর মতন।

ঠিক পরদিনই, আর্তুরো ডি কর্ডোবা, ইকোয়েডরের প্রেসিডেণ্ট, কুইটো বেতারে আতঙ্কমিশ্রিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ইকোয়েডের তার

জাতীয় সঙ্কটের এক চরম মুহূর্তে এসে আজ পৌঁছেচে। আন্দিজ পর্বত শীর্ষের কোটোপাক্সির চূড়োয় যে বিভীষিকাটা বিরাজ করছে—সেটা একটা মহাকাশ-দানব। আক্রমণোদ্যত হলে প্রাণীটার মুখ থেকে নিঃসৃত হয় ভয়াবহ আলট্রা-ভায়োলেট তেজঃতরঙ্গ। ইতিমধ্যে, প্রায় এক সহস্র নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়েছে সে। পরমাণু যুগের এই সন্ধিক্ষণে ও ইকুয়েডরের দুর্দ্ধর্ষ বিমান বাহিনী ওই মহাকাশ প্রাণীর সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমি কুইটো থেকে লোকাপসরণের নির্দেশনামায় স্বাক্ষর দিচ্ছি অতঃপর।

কিউবার গুয়ান্টোনামো থেকে পশ্চাদপসরণের পর কুড়ি বছর কেটে গেছে। মার্কিন নৌ বাহিনীর একটি শাখা গায়নার পারামারিবোর কাছে ঘাঁটি করে বসেছিল। এদের রেডিও চালিত ক্ষেপনাস্ত্রগুলোও দেখা গেল, মহাকাশ প্রাণীটার কোনই ক্ষতি করতে পারেনি। উপরন্তু, আন্দিজ থেকে পারামারিবো—অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল, এই সুদূর তেরশো মাইল পাড়ি দিয়ে মহাকাশ দানবটা অবলীলাক্রমে পারামারিবোর মার্কিন নৌঘাঁটি আক্রমন করে বহু লোকের প্রাণ বিনষ্ট করে আবার আন্দিজের চূড়ায় ফিরে এল।

শেষ পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী সিদ্ধান্ত নেয়, আন্দিজের ওই চূড়োর উপরে নিউট্রন বোমা বর্ষণ করা হবে!

কিন্তু, ইংলণ্ডের জাঁদরেল মানমন্দিরের অধ্যক্ষ, বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার রেমণ্ড জর্জ ঘোষণা করলেন, বিমান, রকেট কিংবা পরমাণু বোমা, এসব কোনকিছুর দ্বারাই ওই মহাকাশপ্রাণীটাকে ধ্বংস করা যাবে না। একে ধ্বংস করতে পারবে একক কোন মহাকাশচারী—যিনি মঙ্গলের পর্বতে অরণ্যে অভিযান করে অভিজ্ঞ হয়েছেন।

এই বিপুল ও বিস্ময়কর পটভূমিকার মধ্যেই ধীরে ধীরে যবনিকা উঠছে বর্তমান এই কাহিনীর। পাঠক স্তম্ভিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন, ঘটনার গতিপ্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে কী নিদারুণ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।)

সংবাদপত্র 'মাটোগ্রোসো ইভনিং' বড় বড় ব্যানারে একটা খবর ছাপলো।

'বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন এবং এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে

কোটোপাক্সির উচ্চতম চূড়া অর্থাৎ ১৯,৩৪৪ ফিট উঁচু চূড়ার কাছে কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে। আন্দিজের সর্বোচ্চ চূড়া চিম্বোরাজোর চেয়েও কোটোপাক্সির বন্যতা এবং দুর্গমতা অতি কঠোর এবং ভয়ঙ্কর! সেই কারণে কোন সুসংবদ্ধ অভিযাত্রীদল সেখানে ইতিমধ্যে পাঠানো সম্ভবও হয়নি এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই অভিযাত্রীদলের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা কেউ বলতে পারে না।'

লিমার বহুল প্রচলিত 'ইকুহটস আমাজোনিয়া' লিখেছে: একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সমস্ত কোটোপাক্সির চূড়োটা যেন ঝলসে গিয়েছিল। কেউ জানেনা, কেউ বলতে পারে না ও ধরণের প্রচণ্ড আলোর ঝলকানির তাৎপর্য্য কী? মার্কিন বাহিনীর ষ্ট্রাটেজিক এয়ার ফোর্সের দুখানা জেট সুপারস্যাবার ৯৬ ব্যাপারটা লক্ষ্য করবার জন্যে কোটোপাক্সির আকাশে উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রচণ্ড আকর্ষণে উপরিউক্ত সামরিক বিমান দুটি কোটোপাক্সির আকাশে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করছেন মহাকাশের কোন গ্রহ থেকে অজ্ঞাত কোন প্রাণী আন্দিজের ওই পর্বত চূড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে!'

বলিভিয়ার জনপ্রিয় দৈনিক 'লা পাজ সান' মন্তব্য করেছে: ব্যাপারটা বিভীষিকাময় হলেও একটা চরম বাস্তবকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবেই। দেখা যাচ্ছে, লিমা এবং পেরুর অন্যান্য শহর থেকে বহু নরনারী দ্রুত অন্যত্র পলায়ন করছে। দুর্দান্ত সুপারস্যাবার ৯৬ জেট বিমান বিদীর্ণ হবার পর জনসাধারণের মন থেকে আস্থার ভাব অদৃশ্য হয়েছে। পেরু সরকার সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে কথা বলছেন। মার্কিন সুপারস্যাবার বিদীর্ণ হবার পর একমাত্র সোভিয়েট 'এম-আই-জি ৭৯' জেট বিমানই আন্দিজের আকাশে উঠে ওই পর্বত চূড়োর আশ্রয়ী মহাকাশের প্রাণীটাকে জব্দ করবার ক্ষমতা রাখে। বলা হয়ে থাকে, রুশ 'এম আই জি ৭৯' অর্থাৎ মিগ ৭৯ একেবারেই দুর্ভেদ্য। বিশ্বে এমন কোন প্রচণ্ড শক্তিশালী বিমান নেই যা ওই 'এম আই জি ৭৯'কে কাবু করতে পারে। 'এম আই জি'র ক্ষেপনাস্ত্র এমনই মারাত্মক যে মুহূর্ত্ত মধ্যেই ওর ক্ষেপনাস্ত্র থেকে বেগনী আলোর রশ্মি বের হয়ে কোটোপাক্সির ওই অজানা বিভীষিকাটাকে ভস্মরাশিতে পরিণত করতে পারবে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রধান সংবাদদাতা জেমস রেষ্টন জুনিয়ার দুদিন পর লিখলেন যে, 'যা আশাঙ্কা করা গিয়েছিলো তাই ঘটেছে। পেরু, কলম্বিয়া এবং ইকোয়েডর থেকে দলে দলে আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী ব্রেজিল এবং বলিভিয়ার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। 'এম আই জি ৭৯' কোটোপাক্সির চূড়ার উপরে বিধ্বস্ত হয়েছে। আর এযাবৎ অজেয় বলে খ্যাত এবং দুর্দান্ত ক্ষেপনাস্ত্র সমন্বিত মিগ ৭৯ কোটোপাক্সির চূড়ার আকাশে গিয়ে ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। গাইডেড মিশাইল বা নিয়ন্ত্রিত রকেট ছুঁড়েও কোন কাজ হয়নি। মার্কিন ষ্ট্রাটেজিক এয়ার কম্যাণ্ডের সুপারস্তাবার ৯৬ তো আগেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এবার মিগ ৭৯ বিধ্বস্ত হওয়াতে প্রমাণিত হলো, অবস্থা গুরুতর।

কুইটো বেতারের সান্ধ্যকালীন বার্তায় ঘোষক প্রচার করলেন, প্রেসিডেন্ট ডি কর্ডোবা অতঃপর স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আন্দিজের ওই অভিশপ্ত পর্বত চূড়োর উপরে হাইড্রোজেন বোমা ফেলা হবে না। মার্কিন বাহিনীর আবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রেসিডেন্ট আশাঙ্কা করছেন, মার্কিন বাহিনীর ওই আবেদন মেনে নিলে কুইটো এবং চিম্বো-রাজ্যের আশেপাশের সব জনপদই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। ভয়াবহ এক শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে কোটোপাক্সির সমতলের সবকিছু! মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বিষ ছড়িয়ে পড়বে ইকোয়েডর, পেরু এবং বলিভিয়ার দিকে দিকে।

রাত্রি দশটায় লিমা রেডিওর বেতার ঘোষক অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন, প্রেসিডেন্ট ডি কর্ডোবা আজ সন্ধ্যায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একখানি তারবার্ত্তা পেয়েছেন। রুশ প্রধানমন্ত্রী পেরুর এই বিপদের সময়ে সর্বরকম সহায়তা করতে রাজী হয়েছেন। আপাততঃ দুজন সোভিয়েট মহাকাশচারী লিমায় এসে পৌঁছচ্ছেন। এদের মধ্যে একজন আন্দ্রে সেরগভ আর অন্যজন ফ্রল রোডিন। আন্দ্রে এবং ফ্রল ইতিপূর্বে চন্দ্রে ঘুরে এসেছেন এবং ফ্রল মঙ্গলগ্রহেও পদার্পণ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞ হিসাবে ফ্রল-এর অভিমত এই যে, কোটোপাক্সির চূড়ায় যে গ্রহপ্রাণীটা এসে আশ্রয় নিয়েছে ওটা মঙ্গল গ্রহ থেকেই মহাকাশে বিচরণ করে পৃথিবীর বিষুবরেখার পশ্চিমাঞ্চলের এই দুর্গম পর্বত চূড়ায় এসে হানা দিয়েছে।

মধ্যরাত্রি পার হলে বেতার ঘোষক আতঙ্কমিশ্রিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এক ঘণ্টারও কিছু আগে কোটোপাক্সির ওই মহাকাশ দানবটা ইকুইটস শহরের উপান্তে উড়ে এসে হানা দিয়েছিলো। কী ভয়ানক এবং বীভৎস তার চেহারা! যেন ষাট ফুট লম্বা আর কুড়ি ফুট চাওড়া একটা বিশাল আকৃতির বাদুড় অন্ধকার রাত্রির কালো আকাশে সাঁই-সাঁই শব্দ করে এসে হাজির হল। ইকুইটস শহরের দশজন জওয়ান পুরুষকে হত্যা করে দানবটা আবার চলে গেছে কোটোপাক্সির চূড়োয়। একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল, ওই নিহত দশজন মানুষের দেহ থেকে একটুও রক্ত ক্ষরিত হয়নি। দানবটা সব রক্ত চুষে বের করে খেয়ে চলে গেছে। দানবটা এক কথায় মঙ্গলের ভয়ানক রক্তপাগল!

বেতার ঘোষক শেষে অবশ্য আস্থার সুরে ঘোষণা করে উঠলেন, মহাকাশচারী যোদ্ধা ফ্রল রোডিন এবং আন্দ্রে সেরগভ এইমাত্র লিমায় এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে উভয়েরই কন্টিনেন্টাল ৬০০ রাইফেল। এই রাইফেল যখন অগ্নিবর্ষণ শুরু করে তখন একই সঙ্গে '৬০০ নাইট্রো এক্সপ্রেস কারটিজ' সবুজ আলোর রশ্মিতে শত্রুর দিকে পলকে ছুটে যায়। আশার কথা, ফ্রল এবং আন্দ্রে কাল দুপুরের পরই কোটোপাক্সির চূড়ো অভিমুখে অভিযান শুরু করবেন।

পরদিনই 'ওয়ার্লড টেলিগ্রাম এণ্ড সান' যা রিপোর্ট দিলে তা যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি লোমহর্ষক। 'সান' এর ভ্রাম্যমান সংবাদদাতা লিখেছেন: প্রেসিডেন্ট ডি কর্ডোবা অতঃপর পদত্যাগ করেছেন। এক সামরিক জুন্টা কুইটোর সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করে বসেছে। লিমা এবং কুইটোর মধ্যবর্তী অঞ্চলের জনপদ থেকে নারী বৃদ্ধ ও শিশুদের দলে দলে অপসারণ করে অতিকায় মাকিন ক্যারিবু বিমানগুলির সাহায্যে ভেনিজুয়েলার কারাকাসের আশেপাশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট নাকি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগে গররাজী ছিলেন। ইউ এস গোয়েন্দা সংস্থার চাপে পড়ে গভীর রাত্রির দিকে তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করতে সম্মত হলেই অবস্থার অবনতি ঘটে। প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত কোটোপাক্সির চূড়োয় নিউট্রন বোমা বর্ষণের অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর দিতে গেলেই সামরিক বাহিনীর ভেতরে বিদ্রোহ শুরু হয়। সাজোঁয়া বাহিনী

এবং ট্যাঙ্ক বাহিনী প্রেসিডেন্ট ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ট্যাঙ্কের কামা গুলো তাদের মুখ উঁচিয়ে রাখে প্রেসিডেন্ট ভবনের গৈরিক রঙে শোভিত অফিস কক্ষের দিকে। ভোর রাত্রির দিকে সজলচোখে ডি কর্ডোবা রাজভবন ত্যাগ করে রওনা হয়ে যান ভেনিজুয়েলার উদ্দেশ্যে। মার্কিন উপদেষ্টাদের বিতাড়িত করে অতঃপর জুন্টা প্রেসিডেন্ট ভবন দখল করে বসে।

ব্রেজিলের 'মাটোগ্রোসো ইভনিং' এর দুঃসাহসী ভ্রাম্যমান সংবাদদাতা সিবাষ্টিয়ান পুরতো লিখেছেন : অবশেষে আমরা রাত্রি শেষ হয়ে এলে রিওবাম্বার তরাইয়ে এসে পৌঁছই। এ তরাইয়ের জঙ্গল গভীর এবং দুর্গম। প্রায় দশ মাইলব্যাপী এই ভয়াবহ জঙ্গল উঁচু হতে হতে শেষ হয়েছে গিয়ে আন্দিজের ঘন এবং দুর্ভেদ্য 'আমাজোনাহাই' মালভূমিতে। মহাকাশচারীর ফ্রল রোডিন এবং আন্দ্রেই সেরগভ আর আগে আগে চলেছেন। এখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে হেলিকেপ্টারটা ফিরে গেছে কুইটোর দিকে।

জংগলের মধ্যে মাঝে মাঝেই অনেক মৃতদেহের সন্ধান পাচ্ছি আমরা। এ সব মৃতদেহ 'আমাজোনাহাই' অঞ্চলের আদিবাসী জংলী ইণ্ডিয়ানদের। প্রত্যেকটি মৃতদেহেরই ঘাড়ের কাছে একটা করে গভীর ক্ষত। প্রথম দর্শনেই মনে হবে হতভাগ্য মানুষগুলির ওই গভীর ক্ষত থেকে কোন রক্ত পাগল দানব যেন তার দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। এ এক অবিশ্বাস্য হতবুদ্ধিকর দৃশ্য। বলা চখে, যে কোন সুস্থ মানুষই এ দৃশ্য দেখলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। এইসব অসংখ্য মৃত দেহগুলি ভক্ষন করবার জন্যে কোন হিংস্র জীব জন্তুরও সন্ধান পাওয়া গেলনা এ দুর্গম ও গভীর জঙ্গলে। সব জন্তু জানোয়ারই পালিয়ে গেছে এ সব অঞ্চল ছেড়ে প্রাণের ভয়ে নয়তো তারা মারা পড়েছে আন্দিজের আরও উঁচুতে আশ্রয় নিতে গিয়ে ওই ভয়াবহ মহাকাশ দৈত্যের আক্রমণে।

বেলা ৮টা ৫০ মিনিট। ১৫ই মার্চ ১৮৯৬ সন। আমি মাটোগ্রোসো ইভনিং-এর ভ্রাম্যমান সংবাদদাতা সিবাষ্টিয়ান পুরতো। বেতারে সংবাদ পাঠাচ্ছি। ফ্রল এবং আন্দ্রেই শেষ পর্যন্ত একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা তিমির চামড়ার স্বচ্ছ তাঁবুর তলায় বসে কফি খাচ্ছি। 'আমাজোনাহাই' এর দুর্গম এবং অভিশপ্ত প্রদেশ পার হয়ে এসেছি আমরা

[৮১ পাতায় দেখুন]

দ্বপ্ করে সব আলো নিভে যায়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের
শব্দে চমকে উঠলাম·····ওয়্যাং মৃত প্রায়·····
ট্রান্সমিটার বিকল·····অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে।

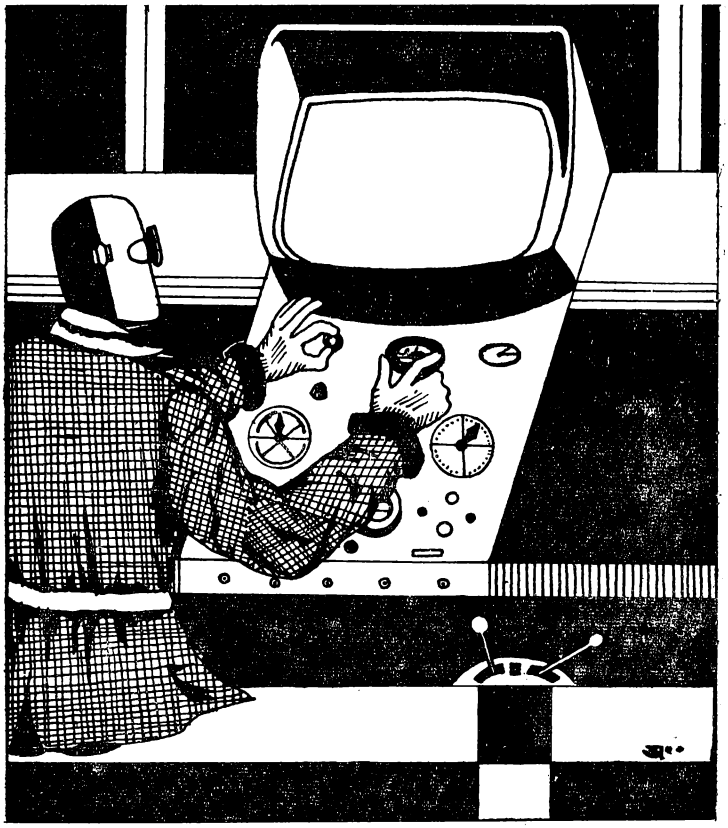

প্রোজেক্ট ভালকান

সায়েন্স ফিকশন এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসটি লিখেছেন—

অমিতানন্দ দাশ

২০১১ খৃষ্টাব্দ।

ডলফাস্ বেস্, বুধ।

মাইনাস—১৪৬° সেন্টিগ্রেড।

ওয়াং আর আমি প্লাস্টিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ট্র্যাক্টরে চড়লাম।

নিকষ কালো বায়ুশূন্য আকাশে ঝকঝকে তারাগুলো মনে হয় যেন হাতের নাগালের ঠিক বাইরে ঝুলে থাকা ফুলঝুরির ফুলকি। প্রায় ১১২ কলা পূর্ণ চিররাত্রির শুকতারাকে দেখাচ্ছে অসম্ভব উজ্জ্বল—ঠিক পৃথিবীর চাঁদের একটা ছোট সংস্করণের মত। পৃথিবী তো ওই উজ্জ্বল নীলচে এক তারা, আর তার ঠিক পাশেই চাঁদ অতি সাধারণ ছোট একটি তারা। সামনে অল্প দূরেই দেয়ালের মত খাড়া, খোঁচা খোঁচা চূড়োওয়ালা ডলফাস জ্বালামুখের প্রাচীর। পিছনে দিগন্তের কাছে শুক্রের আবছা আলোতে চকচক করছে জমাট বাঁধা হাওয়ার হিমবাহ।

ট্রাকটর চালালাম সোজা জ্বালামুখের প্রাচীরের দিকে। প্রাচীরের মাঝখানে সরু চিলতে একখানি খাদ—ট্রাক্টর চলল তার খাড়া পথ বেয়ে। দুধারে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। কালো আকাশের তারার ঝাঁক তাকে আলোকিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

ওয়াং বলল—"বুধে যখন হোটেলটা খুলব তখন গোবি-সাহারা থেকে আসা লোকদের রাখব ওদিকে হিমবাহের কাছে, আর সাইবেরিয়া-এ্যালাস্কা থেকে আসা লোকদের রাখব এই প্রাচীরের মাথায়—চাইকি একটু রোদ-টোদ পোয়াতে পারবে!"

গত কমাসে ওয়াংএর এই কাল্পনিক হোটেল আমাদের অনেক হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

"হ্যাঁ! আমি বলি আর যখন ৩০০ ডিগ্রি রোদে সেই লোকদের হাত-পা পুড়ে শিক-কাবাব হয়ে যাবে তখন সেগুলোকে হিমবাহের ডিপ-ফ্রিজে রাখলে খাদ্য-সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।"

কিন্তু যাই বল বেশ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে—'সূর্যের দোরগোড়ায় জমাট বাঁধা হাইড্রোজেনের পাহাড়', 'বুধের প্রথম উপনিবেশে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

ম্যানেজার' 'তারার আলোতে বসে তরল সীসের হ্রদ দেখুন·····হোটেল কোম্পানীর কটা শেয়ার নেবে আগে থেকে বলে রেখ বাপু, পরে কম পড়লে আমায় দোষ দিও না যেন।

আমি বললুম, আর বিজ্ঞাপনের তলায় ছোট হরফে লেখা থাকবে: "ঘরের বাইরে বেরতে গেলে অবশ্য পাঁচশো কিলো ওজনের স্পেস্‌সুট পরতে হবে', 'আধ ঘণ্টা রোদ পোয়ালে হাতের তেলা পর্য্যন্ত ফোস্কা পড়ে যাবে। 'হোটেলের চার্জটা অসম্ভব সস্তা—দিনে মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা'।"

"আরে না! একবার একটা বড়োসড়ো উপনিবেশ হয়ে গেলে অত খরচা পড়বে না। চাঁদে যদি দিনে দশ হাজার টাকা রেটে তিনটে হোটেল চলতে পারে তো আমি এক লাখ টাকাতে খদ্দের পাব না ভেবেছ? আর প্রোজেক্ট ভালকান কার্যকরী হলে তো বিশ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর অর্দ্ধেক বিদ্যুৎশক্তি বুধ থেকে লেসার আলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে যাবে। তাতেও তো টুরিষ্ট এ্যাট্রাকশন বাড়বে!"

"চালিয়ে যাও! চালিয়ে যাও! এই রেটে বুড়ো বয়সে তুমি স্পেস্ বোর্ডের চীফ পাবলিসিটি অফিসার হয়ে যেতে পারবে।"

ওয়াং বলল—"হুঁঃ!"

চড়াই শেষ হয়ে এখন নীচু ঢাল শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ বাদেই জ্বালা-মুখের বাইরে বেরিয়ে প্রথম সূর্যকে দেখব। বুধের আকাশের বিশাল ভয়াবহ সূর্য! খালি চোখে এই সূর্যের দিকে তাকানো তো যায়ই না, এমন কি সূর্যের দিকে ফোকাস্ করলে টেলিস্কোপ পর্য্যন্ত কানা হয়ে যায়।

বুধগ্রহ সর্বদা সূর্যের দিকে একটা মুখ ফিরিয়ে রাখে, যেমন চাঁদের একটা মুখ সর্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। কিন্তু বুধের এই পিঠ, চিরআলোকিত অঞ্চল, সূর্যের দোরগোড়ায় বলে প্রচণ্ড গরম। আর উল্টো দিকে বুধের যে পিঠ সর্বদা সূর্য থেকে দূরে ফেরানো সেই চির-রাত্রি অঞ্চলে হাইড্রোজেন পর্যন্ত শীতে জমে কঠিন হয়ে হিমবাহের মত স্তূপাকার হয়ে থাকে।

মোড় ঘুরতেই সামনে আলোকিত প্রান্তরের দৃশ্য—মরা, পোড়া, অসংখ্য জ্বালামুখের খাবলা-ওঠা, সেই প্রান্তরের চেহারাটা অনেকটা চাঁদেরই মত। কিন্তু বাঁ দিকে, ঠিক উত্তর বরাবর, নীচু এক টিলার ওপর যে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড উঁকি মারছে তার এই চেহারা সৌরজগতে আর কোথাও মেলে না। এখন অর্দ্ধেকেরও কম দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভর গ্রীষ্মের কুড়ি দিন আগেই সূর্য্যকে দেখাচ্ছে পৃথিবীর সূর্য্যের আটগুণ বড় আর বায়ুহীন আকাশে তার তেজের কথা লিখে বোঝান দুষ্কর। দিগন্তের কাছের সূর্যের আলোতে প্রত্যেকটি ঢিপির কুচকুচে কালো ছায়া পড়েছে লম্বা হয়ে। কালো আকাশ আর কালো ছায়ার মাঝখানে উদ্ভট অর্দ্ধ-গোলাকার সূর্য্যকে দেখে মনে হয় এ যেন এক হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের অগ্নিগোলক।

ঢিপিগুলো পেরিয়ে প্রথম চোখে পড়লো পুরো সূর্য্যকে। দিগন্তের কাছে আকাশে স্থিরভাবে ঝুলে আছে এক আগুনের গোলা, আর তার নীচে, সামনে যতদূর চোখ যায় সাইনাস্ প্রোমেথেই-এর রৌদ্র-ঝলসানো ধূ ধূ প্রান্তর। এই প্রান্তরের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় সূর্য্যের অগ্নিগোলক বুঝি এইবার এক ঝটকা মেরে সমস্ত গ্রহকে বাষ্পীভূত করে দেবে। মনে হয় এই মাঠের ওপারে অগ্নিপিণ্ডটা ওঁত পেতে বসে আছে আমাদের অপেক্ষায়।

ট্র্যাক্টরের সামনের দিকে রোদের তাপমাত্রা ৩২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পিছনের ছায়াতে—৫০° সেঃ। প্রাকৃতিক দৃশ্য অদ্ভুত—রোদে পোড়া প্রান্তরে অল্প দূর দূর ছোট বড় জ্বালামুখ সূর্য্যের তেরচা আলো তাদের তলায় কোনোদিন প্রবেশ করেনি। ধার থেকে তাদের ছায়ায় ঢাকা মুখ-গুলোকে দেখায় এক একটা অতলস্পর্শী কূয়োর মত।

পিছনে ডলফাসের প্রাচীর এখন আর চোখে পড়ে না। ট্র্যাক্টর চলেছে চিরআলোকিত গোলার্দ্ধের মাঝ বরাবর। সাইনাস্ প্রোমেথেই বা প্রোমে-থিউস্ উপসাগরের পশ্চিম ঘেঁষে। আমাদের গন্তব্যস্থল সাইনাস্ প্রোমেথেইএর মাঝখানে এ্যাণ্ট-নিয়াডি পর্ব্বতশ্রেণী। ঘণ্টাদুই বাদে সেই পাহাড়ের চূড়োগুলি দেখতে পাবো।আমাদের দৌড় ওই অবধিই।

তার ওপারে বিষুবরেখার মধ্যে কোন মানুষ এখনো পদার্পণ করেনি। বিষুবরেখার কাছাকাছি এই ট্র্যাক্টরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেই অঞ্চলে রয়েছে তরল টিন ও সীসের খাল-বিল, নালা-ডোবা। আবার শুধু সূর্য্যের তাপে রক্ষা নেই, বিষুবরেখার কাছে আগ্নেয়গিরির সংখ্যাও বেশী। এখানেই ট্র্যাক্টরটা সাবধানে চালাতে হয়—চোরা পাথর বাঁচিয়ে। কোনো কোনো পাথর সূর্য্যের তাপ আর অগ্ন্যুৎপাতের প্রবাহে ভিতর ভিতর নরম হয়ে রয়েছে, কিন্তু উপর থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। তার উপর হেঁটেও চট করে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ট্র্যাক্টর তার উপর গিয়ে পড়লেই তাকে টেনে ধরবে। আর ট্র্যাক্টর সিলিণ্ডার পিঠে, না খেয়ে, খোয়ানো মানে আরকি অক্সিজেন তিনশো কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া। মোটেই সুখদায়ক কাজ নয়!

একমাস ডলফাসের মাইনাস ১৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার শীতার্ত পরিবেশে থাকার পর হঠাৎ এই উষ্ণতার মধ্যে এসে পড়তে একটু অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। তাই এতো বকবক করতে পারে যে ওয়াং, সেও এতক্ষণ চুপ। আমার মনেও অনেক চিন্তা কিলবিল করছে।

ট্র্যাক্টর থেকে এই জ্বালামুখগুলোকে দেখে মনে পড়ে আমার কলেজের বন্ধু রেজার কথা। দুর্ঘটনার রিপোর্ট অবশ্য আমার সব দোষ মার্জনা করে বরং প্রশংসাই করে—বলে ট্র্যাক্টর নষ্ট হওয়ার কারণ শুধু অসাবধানতা নয়; ট্র্যাক্টরের র‍্যাডার যে হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে তা আমার জানার কথা নয়। রেজাকে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে সাহায্য খুঁজতে গিয়ে আমি বরং বীরত্বের পরিচয়ই দিয়েছি, উল্কার আঘাতে রেজার স্পেসসুট ফুটো হওয়াটা দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু আমি যদি থাকতাম তাহলে তো ওই মিলিমিটার—খানেক উল্কার ফুটো সহজেই মেরামত করতে পারতাম। তাহলে আর রেজা অজ্ঞান হয়ে থাকতে থাকতেই ওর স্পেসসুট থেকে সব জীবনদায়ক অক্সিজেন বেরিয়ে গিয়ে ওর দম আটকে আসতো না। রিপর্ট যাই বলুক—

নিজের কাছে আমি নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে পারি নি।

রেঞ্জার সঙ্গে গল্প করতে করতে জ্বালামুখটা খেয়াল করি নি—হুড়মুড় করে যখন ট্র্যাক্টরটা উল্টে পড়ল তখন রেডিওটাও গেল খারাপ হয়ে। আট বছর হয়ে গেছে এখনো ভুলতে পারিনি। দেখলেই মনে পড়ে, ওই জ্বালামুখের ঝাড়। সর্বত্র ওই জ্বালামুখের ঝাড়। চাঁদ, আইও, টাইটান, ...বুধ তো বটেই, এমন কি মঙ্গলেও।

চাঁদ থেকে গেছিলাম মঙ্গলে। 'মঙ্গলে যাবোই' প্রতিজ্ঞা করি আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি—উল্কার ধাক্কায় মার্কিন মঙ্গল অভিযাত্রীদের মহাকাশযান নিখোঁজ হওয়ার পর। মারফী, চেষ্টন আর হার্টগর কোনো খোঁজ মেলে নি। এখনও না। সম্ভবতঃ চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু হয়ত কক্ষচ্যুৎ হয়ে মহাকাশযানটি এখনও সূর্য্যকে চক্কর মারছে এক অভিশপ্ত উড়ন্ত কফিনের মত। যেমন চক্কর খাচ্ছে প্রথম তিনজন রুশ মঙ্গল অভিযাত্রী। দু সপ্তাহের মধ্যে এইরকম দুটি দুর্ঘটনা না ঘটলে এই আমি, সুরজিৎ সোম, আজ আর সাইনাস্ প্রোমেথেইএর উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর চালাবার সুযোগ পেতাম না। যতদিন মহাকাশে রুশ মার্কিনদের একাধিপত্য ছিলো ততদিন ভারতীয় এবং ওয়াংএর মতো চীনেদের আর কে পাত্তা দিতো? কিন্তু ওই স্পেস্ রেসের গাফিলতির জন্য পর পর ছ'জন মহাকাশচারী প্রাণ হারানোর পর কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন সম্ভব হল। অবশ্য এতেও যথেষ্ট চাপ পড়তো না—যদি না মার্কিন মহাকাশযানটি ধ্বংস হতো আন্তর্জাতিক টেলিভিশন প্রোগ্রামের ১১০ কোটি লোকের চোখের সামনে। এখনও মনে আছে—মহাকাশযানের ক্যাবিনের ছবি, চেষ্টনের কথার মাঝখানে হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ হয়ে সমস্ত এলোমেলো হয়ে গেল, আর তার পরেই কমেনট্রেটরের মুখে—"অনিবার্য্য কারণবশতঃ আমাদের এখন মহাকাশযানের প্রোগ্রাম রিলে করা সম্ভব হচ্ছে না..."

সেই বয়সে আমার সবচেয়ে মনের মতো খেলা ছিল 'মঙ্গলগ্রহ যাত্রা'। ছাদে রাখা অব্যবহৃত গংগাজলের ট্যাঙ্কটা ছিল আমার মহাকাশযান। শুধু মঙ্গল কেন? সেই মহাকাশযানে করে বুধ, শনি, প্লুটো···আল্‌ফা সেণ্টরি, পর্য্যন্ত পাড়ি দিয়েছি বহু বার। আর মনে মনে যখন এইসব কল্পনা করছি তখনই আন্তর্জাতিক স্পেস্ বোর্ড স্থাপিত হয়েছে, পেয়েছে মহাকাশের একছত্র অধিকার। ততদিনে তো জাপান, চীন ও ভারতের বহু কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হয়ে গেছে, কাজেই স্পেস্ বোর্ডে এশিয়ার গলা প্রায় রাশিয়া আমেরিকার কাছাকাছিই। এবং তার ফলেই ওয়াং আর আমি চলেছি এখন এ্যাণ্টনিয়াডি পর্ব্বতশ্রেণী অভিমুখে।

রেজা ইরাণী। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, শ্রীহরিকোটা স্পেস্ ইন-ষ্টিটিউটের প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রই ছিল বিদেশী। রেজা আর আমি ছিলাম হরিহর আত্মা। মনে আছে স্পেস্ বোর্ডের বৃহস্পতি অভিযানের আইওতে অবতরণের দিনের কথা। সারারাত টেলিভিশন প্রোগ্রাম। হষ্টেলের মধ্যে রেজার উৎসাহ ছিল সব থেকে বেশী। আমি তো ক্রমাগত ঘুমিয়ে পড়েছি। রেজা দুবার ধাক্কা দিয়ে তুলে কফি খাওয়ালো। তাও শেষটায় আইওর আকাশজোড়া বৃহস্পতির রঙিন ছবির লাইভ ট্রান্সমিশনের সময় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রেজা তো রেগেমেগে প্রায় দশ ঘণ্টা কথা বন্ধ করে দিয়েছিল—যাই বলি উত্তর না দিয়ে শুধু হতাশার ঢঙে মাথা নাড়ে।

পাহাড় গুলো কাছে এসে গেছে, ট্র্যাক্টর চালানোতে আবার মন দিতে হয়। পর্বত শ্রেণীর বিদঘুটে চেহারা। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে প্রায় আট কিলোমিটার লম্বা হয়ে—প্রান্তরের উপরকার ছায়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি দেওয়ালের মতো পাহাড়ের সারির দিকে। আশ্চর্য্য লাগে-দু-মিনিট আগে ট্র্যাক্টরের গায়ে পড়ছিল আগুনের হল্কা, আর এখন ছায়ার মধ্যে বাতাস জমানো শীত। পাহাড়ের দঙ্গলে আমাদের কিছুটা বাঁদিকে একটা আগ্নেয়গিরি—সূর্য আড়াল হয়েছে বলে এবার লাভার লাল আভা এসে পড়েছে আমাদের চারদিকে। পাহাড়ের সারির মাঝখানে একটা খাদ দিয়ে লাভাস্রোত নেমে এসে গড়িয়ে পড়ছে সমতলভূমিতে। লাভা-স্রোতকে দূরে রেখে আমরা পূর্ব দিক ঘুরে পাহাড়ের কাছে চললাম। এই

বায়ুশূন্য জগতে ট্র্যাক্টরের জোরালো হেডলাইটের আলো সমস্ত এলাকাকে অল্পবিস্তর আলোকিত করে তুলেছে। লাভা, হেডলাইট আর শুকতারার আলোয় সমতল ভূমি থেকে খাড়া আন্দাজ ছশো মিটার উঠে যাওয়া পাথরের দেওয়ালকে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন। মনে হয় এটা যেন একটা দৈত্যদের দুর্গ, আমাদের আসতে দেখে গলা পাথর গড়িয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা জানান হচ্ছে। খাদটা কোথায় আছে আগে থেকে না জানলে মনে হত না এই দুর্গে প্রবেশের কোন গোপন পথ আছে। ট্র্যাক্টরটাকে ঘুরিয়ে, খাড়া দেওয়ালের মধ্যে ফাটলের মতো এক সরু খাদের মধ্যে দিয়ে উঠতে শুরু করলাম।

ট্র্যাক্টর খাদ ছেড়ে পাহাড়ের উপর পৌছাল। চারদিকে সাদা ধব ধব করছে ছাইয়ের স্তূপ—হঠাৎ মনে হয় হিমালয় কি এ্যাণ্ডিসের চূড়ায় পৌছলাম বুঝি। আগ্নেয়গিরির গা থেকে নেমে আসছে লাভার স্রোত। কালো আকাশ, জ্বলন্ত সূর্য্য, সাদা পাহাড়, লাল লাভা। কাছাকাছি কোনো পাহাড়ের গায়ে এছাড়া অন্য কোনো রঙের লেশমাত্রও নেই! বায়ুশূন্য গ্রহে আগ্নেয়গিরি থেকে ধোঁয়া বেরোয় না বলাই বাহুল্য—ছাইএর কণা যা বেরোয় হাওয়ায় ভাসবার সুযোগ না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে পড়ে মাটিতে। মাটিতে পড়বার আগে এগুলি এতো জোরে আসে যে চোখে দেখা যায় না, খালি ঘণ্টা খানেক এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই আমাদের স্পেসস্যুট আর ট্র্যাক্টরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছাই জমে যাবে।

ওয়াং এতক্ষণ মগ্ন হয়ে এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখছিল, এখন বলে উঠল—"আগ্নেয়গিরির তেজ বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে না?"

—"হ্যাঁ। তুমিই তো গত সপ্তাহে তাই বললে। এখানকার এই পাহাড়ের ওপরে রাখা সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের রেডিও সংকেতের রেকর্ড দেখালে যখন।"

—"এভাবে সমতল ভূমিতে লাভা গড়িয়ে পড়তে আগে কখনো দেখেছো?"

—"না। তুমি প্রথম বুধে এসে আগ্নেয়গিরিটাকে যে রকম দেখেছ তার আগে বছর খানেক ধরে ওই একই রকম ছিল—কিছুটা তেজ বাড়ে কমে অবশ্য।"

—"তার মানে, তারও আগের রিপর্ট যা পড়েছি তাতে মনে হয় বছর চারেক ধরে যেমন চলছিল এখন তার থেকে আরো বেড়ে উঠেছে, তাই না?"

—"তা বটে। তবে তেমন আগ্নেয়গিরি দেখতে চাও তো যাও মঙ্গলগ্রহের লাওয়েল পর্বত শ্রেণীতে।"

—"মঙ্গলের কথা আলাদা। আর সে কবেকার কথা! সে তো নান-কিংএ কলেজে থাকতেই পড়েছি।"

—'আচ্ছা এখানে তোমার হোটেলের একটা ব্রাঞ্চ খুললে হতো না?'

—"হ্যাঁ, যখন চেইন হোটেল বানাবো শুধু এখানে কেন, বুধের উত্তর মেরুতেও খুলব। আর শুধু বুধেই বা কেন—প্লুটো-টুটোতে ও দু-একটা খোলা যেতে পারে, কি বল? আর এক্ষুনি কয়েকটা ছবি তুলি—

এই ছাইঢাকা পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউণ্ডে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের একটা জুতসই ছবি থেকে বেড়ে পিক্‌চার পোষ্টকার্ড হবে। হোটেলের খদ্দেররা ফ্রি পাবে।"

দুজনে এবার রওনা দিলাম নিজের নিজের কাজে। এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলিকে মাসে একবারের মত দেখে যেতে হয়। ওয়াং গেল ভূতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার যন্ত্রগুলির দিকে—গত মাসের ভূকম্পন, তাপমাত্রা ইত্যাদি তথ্য রেকর্ড করা টেপগুলিকে এনে ট্র্যাক্টরে তুলতে। কিছু তথ্য সোজা রেডিওতে ডলফাসে যায়, ওয়াং তাই নিয়ে নানান হিসেবে পত্তর করে। তবে পুরো তথ্য এই টেপে থাকে, এগুলি মাসে একবার ডলফাস থেকে রেডিও মারফৎ পৃথিবীনে পাঠানো হয়।

আমি গেছি ট্রান্সমিটার আর টেলিমেট্রির যন্ত্রগুলি তদারক করতে। ট্র্যাক্টর থেকে বেরনোমাত্র আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় শুধুমাত্র রেডিও মারফৎ। ওয়াং যেদিকে গিয়েছে সেদিকটা আমার এখান থেকে চোখেও দেখা যায় না। কেবল একবার ওয়াং বলছিল—"ছাইএর ধ্বস দেখেছ কখনো? ওদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা হয়েছে দেখছি। ছবি তুলে রাখছি কয়েকটা।"

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওয়াংকে জিজ্ঞেস করলাম ওর হয়েছে কিনা। কোনো উত্তর নেই। কি? খেয়াল করেনি? না কি?

……কি করি ? হয়তো কিছুই নয়। হয়তো কাজ শেষ করে ট্র্যাক্টরে ঢুকে রেডিও বন্ধ করে দিয়েছে। যন্ত্র ও খারাপ হতে পারে। কিন্তু কোনটাই হওয়ার কথা নয়। ওয়াং এর কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী।

—'হ্যালো, হ্যালো, ওয়াং !……ওয়াং !……ওয়াং !''

হঠাৎ রেজার কথা মনে খোঁচা দিল। কাজ ছেড়ে ট্র্যাক্টরের দিকে এগিয়ে গেলাম। একি ? কোথায় ওয়াং ? ট্র্যাক্টরে নেই, ওদিকে ভূতত্ত্বের যন্ত্রগুলোর কাছেও নেই, লাভার দিকে নেমে যাওয়া ঢালু পাহাড়ের গায়ে কোথাও নেই। বহুদূরে অল্প ঢালু পাহাড়ের গা দেখা যাচ্ছে। উর্দ্ধশ্বাসে হাঁটলেও এই আধঘণ্টায় ওর পক্ষে এই পাহাড়ের গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া মুস্কিল। একমাত্র ব্যতিক্রম যেদিকে আমি ছিলাম সেই দিকটা, তবে সেদিকে গেলে আমিই তো দেখতে পেতাম। আর কোথাও যাবেই বা কেন ? ছাইএর ধ্বসটার কথা বলছিল সেটা তো ওই উল্টো-দিকের পাহাড়ের গায়ে দেখতে পাচ্ছি। এমন হতে পারে কি যে নীচে লাভার কাছে গিয়ে ধ্বসের ছবি তুলতে যাচ্ছিলো……না, পাহাড়টা এতো ঢালু নয় যে গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে লাভাতেই গিয়ে পড়বে। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষটা উবে গেল নাকি ? কোথাও পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছে ? কিন্তু কই ? স্পেস্‌সুটের টকটকে কমলা রং তো সাদা ছাইএর ব্যাক-গ্রাউণ্ডে খুবই চট করে চোখে পড়ার কথা,—দেখছি না তো কোথাও।

ট্র্যাক্টরে টেপগুলোও রাখে নি। আচ্ছা, বললো না একবার টেপ নিয়ে আসছি ? তারমানে টেপ নিয়ে ট্র্যাক্টরের দিকে আসতে আসতে কিছু ? এইটুকু পথ আসতে কি হতে পারে ? আচ্ছা……ওই জ্বালা-মুখটা ? মিটার দশেক চওড়া, ট্র্যাক্টরটা আর ভূতত্ত্বের যন্ত্রগুলোর প্রায় মাঝ পথে—আরে ! আরে ! ওর পাশে ওটা কি ! ওই ছাই রঙের একটা টেপের রিল না ?……

জ্বালামুখ, রেজা…ছুটতে শুরু করেছি। কত গভীর জ্বালামুখটা ?… অল্প মাধ্যাকর্ষণে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়, কিন্তু ছোটা দুরূহ কাজ……হোচট খাচ্ছি, একশো মিটার পথ ফুরোতেই চায় না……

পৌঁছলাম জ্বালামুখটার পাশে। পাঁচ-ছ মানুষ চওড়া অন্ধকার হাঁ

করা মুখ। ওই তো ওয়াংএর পায়ের ছাপ ধার পর্য্যন্ত—পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, জ্বালামুখের ধারের কিছুটা ছাই ধ্বসে পড়ে গিয়েছে। জ্বালামুখটা কতো গভীর? নামবার চেষ্টা করব? টর্চ থাকলে ভালো হত। আমারো যদি কিছু হয়? দুজনেই যদি আহত হয়ে এখানে পড়ে থাকি? বুধগ্রহে তৃতীয় প্রাণী ডিক্টর তো টেরও পাবে না আমাদের কি হলো। একটা বই ট্র্যাক্টরও নেই, আর থাকলেও ডলফাস্ বেস্ ফাঁকা ফেলে বেরিয়ে আসাও ভিক্টরের বোকামি হবে। স্পেস্ রেগুলেশন বিরোধী কাজও বটে।

ট্র্যাক্টরে গিয়ে টর্চ আনবো? কিছু না! হয়ত রেজার মত ওয়াংএর স্যুট ফুটো হয়ে গিয়েছে—অক্সিজেন বেরিয়ে গিয়ে স্যুটের ভিতরকার চাপ কমে যাচ্ছে ক্রমশঃ। হয়ত মর মর হয়ে গিয়েছে। না, দেরিনা। 'জয় মা' বলে জ্বালামুখের মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিলাম। মাত্র মিটার দেড়েক গভীর ধারের দিকে। কিন্তু সেখানেই ছায়াতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ নেই, হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়াচ্ছি।

এই তো!—ওয়াং তো বটেই! স্পেস্ স্যুট। বেঁচে আছে? মাথা. হাত—না, জ্ঞান নেই। ওর হাত নাড়ছি, কোনো সাড়া নেই। কথা বললে সাড়া নেই। কথা বললে সাড়া পাবো? আমার স্পেস্ স্যুটের শিরস্ত্রাণ ওর শিরস্ত্রাণে ঠেকিয়ে চেঁচাতে লাগলাম—"ওয়াং!.....ওয়াং!" না অজ্ঞান হয়ে গেছে তবে নিঃশ্বাস পড়ছে, শুনতে পেলাম কান পেতে, ওয়াংএর হেলমেটের সঙ্গে আমার হেলমেট ঠেকিয়ে। কিন্তু স্পেস্ স্যুটের আল্‌গা অংশ গুলো তো ঠিকই ফুলে আছে। ভিতরে হাওয়ার চাপ আছে ঠিকই। তবে? আহত? কোথায়? দেখি এই বুক, পেট, কোমর, উরু, বাঁ পা, ডান পা কই? এই যে—বোঝা গেল। ডান পা উরু থেকে ছাই চাপা-পড়েছে। তার তলায় স্যুট ফেঁসে যায় নি আশা করি। তবে অজ্ঞান যখন, পা ভেঙ্গেছে নিশ্চয়ই। সাবধানে ছাই সরাতে হবে—ওয়াংএর প্রাণ এখন আমার হাতে। তবে মনে হয় তাড়া নেই, সাবধানতরই দাম বেশী।

ছুটে গেলাম ট্র্যাক্টরে। ভিক্টরকে রেডিওতে এমারজেন্সী কল। ডলফাস বেসে এ্যালার্ম বাজলে—ভিকটর এ্যালার্ম শুনে এসে যোগাযোগ করল। ভিকটর আধা-ডাক্তার—প্রাণীতত্ত্ববিদ, স্পেস্ মেডিসিনের একটা

বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছে। বললাম—"কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্চার হলে কি করবো?"

—"আশা করি হয় নি। তেমন খারাপ ধরণের হলে আমারও কিছু করার থাকবে না।"

—"তা বটে, দশ কোটি মাইলের মধ্যে তো এক্স-রে মেশিন পাবে না।"

—"আর একটা কথা। শুধু পায়ের চোটের জন্যই অবশ্য অজ্ঞান হতে পারে, তবে সম্ভাবনা কম। শরীরের আর কোথাও চোট লেগেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখো।"

—"যথা?"

—"খুব সম্ভবতঃ মাথায়। তবে সমস্ত শরীরই পরীক্ষা করে দেখো। উপর-উপর কিছু কালশিটে-জাতীয় চোখে পড়লে আমায় জানিও। আর পায়ের অবস্থা তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জানাবেই।"

—"তোমার ওষুধপত্র রেডি করে রাখো, আমি ফুলস্পীডে ট্র্যাকটর চালিয়ে এই ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই ওয়াংকে ডলফাসে এনে ফেলছি।"

—"তার মধ্যে আমাকে পৃথিবীতে রিপর্ট করতেও তো হবে। আচ্ছা, বলো তো. ওয়াংএর যদি সত্যি তেমন গুরুতর কিছু হয়ে থাকে, তবে ওকে বাঁচাতে পৃথিবী থেকে রেস্কিউ রকেট পাঠাবে কি?"

—"একটা রকেট পাঠাতে খরচ তো প্রায় হাজার কোটি টাকা, আড়াই বিলিয়ান ডলার। আর সময় ও লাগবে মাস খানেক। লাভ আছে?"

—"কি রকম চোট লেগেছে তার ওপর নির্ভর করে। যদি ধর কোমরে, কি বুকে. কি মাথায় অস্ত্রোপচার করতে হয়, আমি তো আর তা পারবো না; তবে আমার কাছে এমন ওষুধ আছে প্রায় যে কোন রকম শরীরের অবস্থায়, যে অবস্থায় রুগীকে কুড়ি বছর আগেও বাচান মুস্কিল ছিল, তাকেও, কয়েক মাস অজ্ঞানের মত বাঁচিয়ে রেখে দেওয়া যায়। ছমাস তো বটেই।"

—"তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে?"

—"হ্যাঁ। এই রকম একটা হতে পারে আমার ভয় অনেকদিন থেকেই। আমি তো ডাক্তার নই, প্রাণীতত্ত্ববিদ। এরকম মানুষের প্রাণ নিয়ে কারবার করার তো আমার অভ্যাস নেই, করতে বেশ ভয় করে। যাইহোক, দরকারের সময় গাফিলতি হবে না। তুমি তাড়াতাড়ি ওয়াংকে খুঁড়ে বার করো। অনেকক্ষণ কথা হলো, এখন ছাড়ি।"

টর্চ আর কিছু খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে জ্বালামুখটায় নামলাম আবার। ওয়াংএর মুখ দেখলাম প্রথমেই—হ্যাঁ। হেলমেটের মধ্যে রক্ত। মাথার পিছনে চোট লেগেছে, ভিক্টর আশঙ্কা করেছে ঠিকই। তবে চট করে ভয়ের কিছু কারণ আছে বলে মনে হচ্ছে না। টর্চটা মাটিতে রেখে অল্প অল্প করে খুঁড়ছি। খুব সাবধানে। আস্তে আস্তে ওয়াংএর পায়ের ওপর পড়া ছাই এবং পাথর সরিয়ে ফেললাম! শুধু গোড়ালীতেই চোট লেগেছে দেখছি, গোড়ালি থেকে পাটা কেমন এক অস্বাভাবিক কোনে বেঁকে রয়েছে।

ওয়াংকে কাঁধে করে জ্বালামুখ থেকে তুলে ট্র্যাক্টরে এনে ফেললাম। স্পেসস্যুট শুদ্ধ পৃথিবীতে সাড়ে তিনশো কিলোগ্রাম ওজন হবে, তবে বুধের অল্প মাধ্যাকর্ষণে সেটা খুব বেশী কিছু নয়। প্রথমেই ওর হেলমেট খুললাম—রক্ত বেশী পড়ছে না, তবে হেলমেটের সঙ্গে মাথা বেশ বেকায়দায় ঠোক্কর লেগেছে। মস্তিষ্কে কি রকম চোট লেগেছে কে জানে? ফার্স্ট এইড দিলাম।

আবার ট্র্যাক্টর চালালাম, ভিক্টরকে খবর দিলাম। পাশে ওয়াং, এখনও অজ্ঞান, জ্বর এসেছে। একা চলেছি সাইনাস প্রোমেথেই পার হয়ে। যাই হোক রেজার মত অবস্থা হয়নি। তবে রেজা তখন বেঁচে গেলেই আর ভাবনা ছিলো না—তিন দিনে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতো। তবে ওয়াংএর ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ অন্য, বাঁচানোর জন্য কি একটা রকেট পাঠানো হবে? মনে হয় হবে—কারণ মানুষের সেন্টিমেন্টালিটির কি আর সীমা আছে? টেলিভিশনে যেই শোনা যাবে একজন লোক বুধগ্রহে মর-মর হয়ে পড়ে রয়েছে, অমনি পৃথিবী শুদ্ধু হৈ হৈ পড়ে যাবে। হাজার কোটি টাকা? কুছ পরোয়া নেহি! শুধু যদি গোড়ালিতে চোটটা গুরুতর হয়, তবে ওয়াংএর ভাগ্য খারাপ—গোড়ালি ভাঙা অত্যন্ত আনসেন্টিমেন্টাল ঘটনা, একটা গোড়ালির জন্য হাজার কোটি টাকা? রাম কহ!

মাথার চোট ঠিক হয়ে যদি শুধু গোড়ালিতে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো ওয়াংকে খোঁড়াই থেকে যেতে হবে।

তবে আবার যদি মাথায় সেরকম গুরুতর চোট লেগে থাকে? ভিকটর তো বলে দিলো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু সত্যি যদি ভয়ের কারণ না থাকে তবে ওর কথাই বা নার্ভাস শোনাচ্ছিল কেন? আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিশ্চয়ই বিপদের কথা কমিয়ে বলেছে। নাঃ, ডাক্তারদের নিয়ে আর পারা গেল না। সব মিলিয়ে রেজার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তো? খালি রেজার কথা মনে পড়ছে।

রেজার কথা আরো বেশী করে মনে আছে বৃদ্ধ রেজার জন্য। প্রতি বছর রেজা আমাকে ওদের বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করতো। শেষে গিয়েছিলাম—১৯৯৯ সলের গ্রীষ্মের ছুটিতে। রেজাদের বাড়ী তাব্রিজের পূর্বদিকে, রুশ সীমান্তের কাছে, ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে ওঠা এলব্রুজ পাহাড়ের গায়ে। সেখানে রেজাদের বিরাট বাড়ী আর খাশা পার্সী বাগান। সেই গাছের তলায় বরফগলা জলের ঝর্ণার ধারে ঘাসের গালিচায় শুয়ে বহু নীচে দিগন্তবিস্তৃত ক্যাস্পিয়ান সাগরের উপর পিঁপড়ের মতো ছোট ছোট মাছ ধরা জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে আমরা দুই স্পেস কম্যুনিকেশন এঞ্জিনীয়ার মাসখানেকের জন্য প্রায় ওমর খৈয়ম বনে গিয়েছিলাম। রেজার দুই দিদি থাকলেও ওই একমাত্র ছেলে। ওর বাবা বিপত্নীক, পশমের ব্যবসাদার। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে পশমের ব্যবসা না করলেও রেজা যেন ইরানের কাছাকাছি কোথাও থাকে। শ্রীহরিকোটাতে যাবার সময়েই রেজার সঙ্গে ওর বাবার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। বৃদ্ধ রেজার প্রশান্ত মুখের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আভিজাত্যের ছাপ, কিন্তু তার উপরেই আদরের ছোট ছেলের সঙ্গে এই মনোমালিন্যের বেদনার দাগও গভীর হয়ে পড়েছে। কোনো পক্ষ থেকেই যে ভালোবাসার অভাব ছিল তা নয়—এ শুধু দুই পুরুষের মধ্যে চিন্তাধারার ফারাক—রেজা পশমের ব্যবসার বিন্দুমাত্রও বুঝত না, বোঝার ইচ্ছা প্রকাশও করে নি; আর বৃদ্ধ রেজা নিজেকে একাবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে খাপ খাওয়াবার কোনো চেষ্টাই করেন নি, তাঁর মতে চাঁদে যাওয়াটাই অনর্থক গোঁয়ার্তুমি।

ছোটবেলা থেকে এলব্রুজ পাহাড়ের এই স্বর্গে মানুষ হয়েও রেজা

পৃথিবীর শ্যামলিমা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বদ্ধপরিকর। আর শেষে সে প্রাণ হারালো ৎসাইলকোভস্কী জ্বালামুখের সেই রুক্ষ, কর্কশ প্রান্তরে! আর ভুলতে পারি না বৃদ্ধ রেজার সেই টেলিগ্রাম। তার দুঃখের গভীরতা মাপা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাঁর সৌজন্যও অতুলনীয়, স্থানকাল পাত্র নির্বিশেষে অভিজাতসুলভ। তিনি কিনা এলব্রুজ পাহাড়ে বসে দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ামাত্র নিজের দুঃখ ভুলে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে টেলিগ্রাম করলেন। আর যে আমিই কিনা রেজার মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী! এরপর আর রেজাকে ভুলি কি করে? বছর দুই বাদে মঙ্গলগ্রহে বসে খবর পাই যে রেজার মৃত্যুর পরই বৃদ্ধ রেজার শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন।

রেজা বা ওয়াংএর মতো অবস্থা আমাদের যে কারুর হতে পারে সেকথা জেনে শুনেই আমরা পৃথিবী ছেড়ে পা বাড়িয়েছি—চাঁদে অবশ্য আজকাল বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমে গিয়েছে—তবে বুধ বা টাইটান আইও একেবারে অন্যরকম। চাঁদের লোকসংখ্যা এখন তিন হাজারের উপর—এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই স্পেস বোর্ডের কাজ করেন এরকম কয়েকশো পরিবারও আছে। আর বুধে তো কুল্লে আমরা তিনজন, কি এখন ওয়াংএর যা অবস্থা, আড়াই জনই বলা উচিত। চাঁদ, কি মঙ্গলগ্রহও বটে, যেন অনেকটা পোষ মেনে এসেছে। কিন্তু আর সব গ্রহ এখনো পুরো বন্য, হিংস্র। বুধে আমরা রয়েছি দু বছরের উপর। কিন্তু বুধের সাড়ে ছয় কোটি বর্গ কিলোমিটার এলাকার সাড়ে ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটারে আমাদের পায়ের ছাপ পড়েছে কিনা সন্দেহ! চাঁদের চেয়ে বড় গ্রহ—পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের প্রায় অর্দ্ধেক এলাকা জোড়া গ্রহ—তার উপর শুধু আমরা তিনজন মানুষ।

গ্রহের চিরআলোকিত দিক থেকে এবার ডলফাস জ্বালামুখের প্রাচীরের দিকে চলেছি। বাঁদিকে চকচক করছে প্রাজেক্ট ভালকানের সৌরচুল্লীর এ্যালুমিনিয়মের কাঠামো। বুধে ডলফাস বেস স্থাপন করার প্রধান কারণ এই সৌরশক্তি কাজে লাগানোর গবেষণা, যার নাম প্রোজেক্ট ভালকান, আর প্রোজেক্ট ভালকানের যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করার ভার আমার হাতে। গত সপ্তাহে টেলিভিশনের জন্য প্রোজেক্ট ভালকানের উপর একটা লেকচার দিয়েছি, কালকে শুনতে পাবো।

মাঝে মাঝে মনে হয় কেন এই পোড়া গ্রহ বুধে পড়ে রয়েছি তখন মনে করি এই প্রোজেকট ভালকানের কথা। ডলফাস্ জ্বালামুখের প্রাচীরের কাছাকাছি এসে পড়েছি—বাড়ী পৌঁছলাম প্রায় বাড়ী? বাড়ী! হ্যাঁ ডলফাস্ বেস্। নামে "বেশ"। হ্যাঁ যন্ত্রপাতি আছে সেখানে কোটি কোটি টাকার। কিন্তু থাকার জায়গা? থাকার জায়গা বলতে শুধুমাত্র দশ মিটার চাওড়া এস্কিমোদের ইগ্লুর মতো অর্দ্ধাগোলাকার প্লাষ্টিদের একটা ঘর। তার মধ্যেই আবার পার্টিশন করা চারটে অংশ। এবং সেই একটা অংশে আমাদের তিনজনের শোবার জায়গা।

মনে হয় কতকাল এভাবে থাকবো? দশ বছর বাদে কি করবো? কুড়ি? চল্লিশ? ওয়াংএর তাও আহত হয়ে একটা সুযোগ হলো পৃথিবীতে ফেরার, কিন্তু আমার মতো যারা দশ বছরের উপর পৃথিবীর বাইরে রয়েছে, তারা প্রায় পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড নিয়েছে বলা যায়। পৃথিবীতে ফেরার ইচ্ছা সর্বদা দমন করে চলতে হয়—কেউ কি কখনো নিজের ইচ্ছায় চুয়াল্লিশ বছর আয়ুক্ষয় করতে পারে?

কেন? হ্যাণ্ডবুক অফ স্পেস্ ফিসিওলজির ৮৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য :—

38.14 Life Expectancy in Space

Early space physiological studies in the 1970s showed that life expectancy is definitely increased by reduced gravity, though not by total weightlessness. For persons living in astronomical bodies having gravities between 15% and 40% of earth's gravity, reliable and simple empirical formula for life expectancy have been derived by Benediktov[42]. If a person having adequate physical fitness[43] and a life expectancy of 90 years (avaage, 2001 world census) leaves earth at an age 'a' his life expectancy in space becomes

$$Es = a + \frac{3}{2}(90 - a) \text{ yrs} \ldots (38.132)$$

After a person becomes adapted to a reduced gravity, a return to increased gravity has very deleterious effects, specially on the cardiovascular system[44]. If a person returns to earth, still physically fit, after a period of 'y' years in an astronomical body having reduced gravity, his life expectancy on earth becomes

$$Ee = 90 - 5\sqrt{y},\ \text{yrs}...(38.133)$$

the formula being valid for $20 > y > 0.5$ and $a < 50$.

অর্থাৎ কিনা অল্প মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে কয়েক বছর থাকলে আয়ু বেড়ে যায়, কিন্তু তারপর আবার পৃথিবীর বেশী মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পড়লে শরীর ভেঙ্গে পড়ে, তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যেতে হয়। আমি প্রথম চাঁদে যাই ২৬ বছর বয়সে, আর চাঁদ, মঙ্গল ও বুধে পৃথিবীতে না ফিরে মহাকাশে থেকে গেলে আমি বাঁচবো হয়তো $২৬ + \frac{৩}{২}(৯০ - ২৬) = ১১৮$ বছর বয়স অবধি। আর এখন পৃথিবীতে ফিরে বাকি জীবনটা পৃথিবীতেই কাটালে বাঁচবো আন্দাজ $৯০ - ৫\sqrt{১০} = ৭৪$ বয়স অবধি মাত্র। চুয়াল্লিশ বছর অতিরিক্ত বাঁচার লোভে মানুষ কি না করতে পারে।

তবু কখনো কখনো মনে হয় চুলোয় যাকগে ওই চুয়াল্লিশ বছর। পৃথিবীতে ফিরে এই স্পেস্ সুট, এয়ার লক ছেড়ে একটু বাঁচার মত বেঁচে নিই; কতদিন ফুলের গন্ধ শুঁকিনি; নদী, সমুদ্র কেন ট্যাঙ্ক আর গেলাসের বাইরে কোনো জলই দেখি নি; একসঙ্গে দুজনের বেশী লোকই তো দেখি নি দুবছর হল। মঙ্গলে তবু কিছু শ্যাওলা ছিল—পুরো মরা গ্রহ বুধ। খালি কালো, সাদা, ছাই, খয়েরী দেখে দেখে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। সবুজ আর নীল কতদিন দেখি নি! নীল আকাশ!

না! এই দুবছরে মানসিক ভাবে আমাকে কাবু করে এনেছে। এই প্রায় পৌঁছে গিয়েছি ডলফাসে—

ক্রিরিরিরিং·····ক্রিরিং·····ক্রিরিং·····ক্রিরিরিরিং·····

ঘুম ভেঙ্গে গেল। কেমন জানি অস্বস্তি লাগছে। শুধু এ্যালার্মের আওয়াজ নয়, আরো কিছু। কি যেন গোলমাল হয়েছে·····

ভিক্টর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে চেঁচাচ্ছে—"সোম! সোম! শিগ্রীর ওঠো, উঠেছো? কণ্ট্রল প্যানেলের দিকে একবার এসো।"

এতো উত্তেজিত কেন? অস্বস্তি আমারো লাগছে, কি যেন হওয়ার কথা, হচ্ছে না, ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। এ্যালার্ম মানে কিছু যান্ত্রিক গোল-যোগ তো বুঝলাম। কিন্তু গতবার এ্যালার্ম বেজেছিল মাইক্রোওয়েভ রেক্টিফায়ার ইউনিটের একটা ট্রানজিষ্টার পুড়ে যাওয়ার দরুণ। এমন কি গোলযোগ হতে পারে যে জন্য ভিক্টর এতো উত্তেজিত?

ওয়াং ঘুমোচ্ছে। আমার তখনও ভালো করে ঘুম ভাঙ্গে নি। ভাঙ্গলো যখন হঠাৎ খেয়াল হলো কেন ভিক্টর এতো উত্তেজিত—এয়ার পিওরিফায়ারের পাম্পের আওয়াজ নেই। দুবছর ধরে যে আওয়াজ সমানে শুনে আসছি তা না শুনে অস্বস্তি লাগছিল কিন্তু ঠিক খেয়াল হচ্ছিলো না যে কি হচ্ছে না।

ভিক্টর আবার তাড়া দিল—"চট করে এসো! কি হয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না।"

উঠতে উঠতে মাথায় চিন্তা ঘুরতে লাগল। ঘরের অক্সিজেনে আমাদের মাত্র এক সপ্তাহ চলবে। এয়ারপিউরিফায়ার চালু না থাকলেই নয়। ট্যাঙ্কে আরো অক্সিজেন আছে, তবে সেটা ব্যবহার করতে গেলে আমাদের দিনরাত স্পেসসুট পরে বসে থেকেও মাস খানেকের বেশী চলবে না। আর দিনরাত স্পেসসুট পরে থাকা মানে, যে কখনো স্পেসসুট পরে নি তাকে বোঝানো মুস্কিল।

কণ্ট্রল রুমের দরজায় এসেই দেখলাম-প্রোজেক্ট ডালকানের কণ্ট্রল প্যানেলের বিপদসূচক বড় লাল আলোটা ধক ধক করে জ্বলছে।

—"সৌরচুল্লী থেকে আসা পাওয়ার লাইনে কারেণ্ট নেই। ডালকান উপগ্রহের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।"

আমি তো এর কিছু কুলকিনারা করতে পারছি না। ষড়যন্ত্র করে যেন প্রোজেক্ট ডালকানের সব যন্ত্র এক সঙ্গে খারাপ হয়েছে।" আমিও

ততক্ষণে কণ্ট্রোল প্যানেলে পৌঁছে গেছি। বললাম—"আশ্চর্য তো! সৌরচুল্লী থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আসছে না আর একই সঙ্গে ভালকান ৪ এর সঙ্গে রেডিও-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভালকানের ভার্নিয়ার রকেট খারাপ হয়ে গেছে। ভিক্টর বলল—"কিন্তু সৌরচুল্লী থেকে সংকেত তো আসে তারে করে—ভালকান উপগ্রহে গোলমাল হলে তার জন্য এই সংকেত না আসার কারণ দেখছি না।"

—"আমিও তাই ভাবছি।"

—ফুয়েল সেল সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ। সেদিক থেকে কোনো ভয় নেই। আমি বরং এয়ার পিওরিফায়ারটা চালু করে দিই, কি বল?

বললাম—হ্যাঁ। তা বটে, তোমার তো আবার চিড়িয়াখানার কথা ভাবতে হবে। চিড়িয়াখানা মানে আরকি ভিক্টরের গবেষণার জীবজন্তু—মাছি থেকে ছাগল পর্য্যন্ত যাদের উপর সূর্যের রেডিয়েশনের প্রভাব নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

—দুটো গোলযোগের মধ্যে সত্যি কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছো না? আমার তো ব্যাপারটা সুবিধে ঠেকছে না।

বললাম—ভেবে দেখতে হয়।

আমরা তখনও মনে করছিলাম ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রোজেক্ট ভালকানের সৌরচুল্লীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে পরীক্ষামূলক ভাবে। কাজেই যান্ত্রিক গোলযোগের ভয়ে ডলফাসে বাড়তি ফুয়েল সেল আর নিউক্লিয়ার ব্যাটারী রাখা আছে। এয়ার পিওরিফায়ার চালু থাকলে প্লাষ্টিকের ঘরের মধ্যে যা অক্সিজেন আছে তাতেই হেসেখেলে এক মাস চলে যাবে। কিন্তু তখনও তো আর বুঝিনি যে ডলফাসে বিপদের এই সবে শুরু।

বললাম—একদিক দিয়ে ভালকান—৪ ওয়াংএর একটা উপকার করে দিলো। মাস দুয়েকের মধ্যে আমাদের বাঁচাতে একটা রকেট আসবে বলেই তো মনে হয়।

—আর ততদিনে যদি ওয়াং ভালকানের প্রথম শহীদ হয়ে যায় তবে সে একটা দশ কোটি মাইল ফিউনেরাল মার্চের সম্মান পাবে। কতজনের ভাগ্যে আর তা জোটে ?

—এতো গুরুতর অবস্থা ? ঘুমোচ্ছে বলে মনে হলো যে ?

—এ ঘুম সেমি কালনিদ্রা বলতে পারো—কোমাটোস্ হয়ে রয়েছে। এই দেখ না টেলিপ্রিন্টারের কাগজ—তিন ঘণ্টা ধরে পৃথিবীর স্পেস বোর্ডের এক নিউরোলজিষ্টের সঙ্গে কথা চালিয়েছি। আর পারা যায় না। এক একটা কথা পৃথিবীতে পৌঁছতে লাগছে দশ মিনিট। এভাবে ডায়াগনসিস হবে কিনা সন্দেহ। হয়েই বা কি হবে ? আমি তো আর ওর মাথায় অস্ত্রোপচার করতে পারবো না।

—তোমার আর কি করার আছে ? ডলফাসে যা সরঞ্জাম আছে তাতে তুমি কেন, কোনো নামজাদা ব্রেন সারজিয়নও মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করতে সাহস পাবে কিনা সন্দেহ।

—এই স্পেস বোর্ডের হাতুড়ে ডাক্তার তৈরীর ট্রেনিং না নিয়ে যদি ভালোভাবে ডাক্তারী শিখতাম তবে অস্ত্রোপচার না হোক সাধারণভাবে ওয়াংএর চিকিৎসা আরো ভালোভাবে করতে পরতাম। যে রোগীর কুড়ি ঘণ্টায় একবারও জ্ঞান ফেরেনি, এমনকি জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না, সে আমার চিকিৎসায় ডলফাসে কয়েক মাস টিকে থাকবে বিশ্বাস করা কঠিন ?

ওয়াংএর বিষয়ে ভিক্টরের মনের ভাব দেখি রেজার বিষয়ে আমি যেরকম ভাবতাম অনেকটা সেই রকম। ওর অবশ্য দোষ আমার চেয়ে কম। তবে আবার ওয়াং হয়তো কয়েক সপ্তাহ আধমরা হয়ে থাকবে ভিক্টরের চোখের সামনেই।

—ভিক্টর ! তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। ওয়াং মনে হয় দু মাসের মধ্যেই পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে। আর বেশী উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেই বুঝবে, আমাদের কারুরই দোষ নেই। ডলফাস বেসে আমরা শুধু তিনজন তার কারণ হিসাব করে দেখা গেছে যে এখানে তিন-

জনের বেশী লোক রাখা পোষায় না। আর তিনজনের মধ্যে ডাক্তার নেই কারণ সেও পোষায় না বলে।

—আমি তো আর কচি খোকা নই। তুমি যা বললে তা আমি জানি। সেটা তুমিও জানো। স্পেস বোর্ডে ডাক্তার থাকা পোষায় না হিসাব করেছে বটে, তবে সে হিসাবে মিথেন-মাইক্রোওয়েভের তুলনায় একটা মানুষের জীবনের মূল্য বড্ড কম ধরা হয়েছে। তুমি এটা অস্বীকার করো দেখি ?

বললাম—এ বিষয়ে আমি একমত নই তো জানো। তোমার মনের অবস্থাও বুঝি। কিন্তু এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

—ঠিক আছে। কিন্তু ওরকম গায়ে পড়ে স্পেস বোর্ডের সমর্থনে যেও না। স্পেস বোর্ড কি ভুল করতে পারে না ?

—আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। এবারকার মতো মাপ করবেন। এখন বিরতি হোক।

—ঠিক আছে। নাহয় ঘুমতেই যাচ্ছি। ক্লান্ত ছিলাম বলে বোধহয় একটু বেশী মাথা গরম করে ফেলেছি—দুঃখিত।

ভিক্টর চলে গেল। ওর ওপর চাপ পড়েছে সত্যি! এইতো এখন শুতে হবে ওকে ওয়াংএর উল্টো দিকের বাঙ্কে। ওয়াংএর কথা যে ভুলে থাকবে সে ফুরসুৎ নেই। ডলফাস বেসের নেতা হিসাবে ভিক্টরের সামনে আমাকে সংযত হয়ে থাকতে হচ্ছে বটে, তবে ভালকানের এই দুর্ঘটনায় আমারও মনে ঘা লেগেছে। আর বুধে থাকতে ইচ্ছা করে না। এখন হাপিয়ে উঠেছে।

একটা কোনো বিশেষ কাজের প্রতি জোরালো টান না থাকলে এরকম বছরের পর বছর বুধগ্রহে থাকা অসম্ভব। আমার যেমন প্রোজেক্ট ভালকান, ভিক্টরের আকর্ষণ তেমনি ওর "চিড়িয়াখানা"। আমাদের ঘরের প্লাষ্টিকের দেওয়াল পাঁচ সেন্টিমিটার পুরু এ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে মোড়া। সূর্যেররেডিয়েশন বুধের গায়ে এমন প্রবল স্রোতে এসে পড়ে যে সাধারণ স্পেসসুট পরে বুধে বেশীক্ষণ চলাফেরা করা সমীচীন নয়। ভিক্টরের গবেষণার জীবজন্তুদের রাখা হয়েছে এ্যালু-

মিনিয়ামের পাতের মোড়ক না দেওয়া একটি ঘরে। তিনবছর ধরে সূর্যের রেডিয়েশনে তাদের শরীরে কি ক্ষতি হচ্ছে দেখে যাচ্ছে ভিকটর।

কাজ শুরু করতে হয়—পৃথিবীর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধরে চললো টেলি-প্রিন্টারে ভালকান-৪এর গোলযোগের বিষয়ে রিপর্ট ও প্রশ্নোত্তর। তারপর ভালকান-৪ এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের বড়, কুড়ি মিটার ব্যাসের পিরীচের মতো ডিশ এরিয়ালের সাহায্যে ভালকান-৪এ সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করলাম। ভালকান উপগ্রহটাই কি পুরো ধ্বংস হয়ে গেল? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৌরচুল্লীতেই বা গড়বড় হলো কেন? তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হলো কি করে?

স্পেস বোর্ডের আন্তর্জাতিক খবরের সময় হয়েছে। দেখি আমাদের বিষয়ে কি বলে—শুরু হয়ে গেছে—

"...জ্বালামুখের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ ওয়াং-লি-পো আহত হয়ে পড়েন! জানা গিয়েছে যে তাঁর মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাৎ লেগেছে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।.....''

প্রোজেক্ট ভালকানের নেতা ডাঃ সুরজিৎ সোম আমাদের জানিয়েছেন যে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগে ভালকান-৪ নামক বুধগ্রহের সিন্‌ক্রোনাস উপগ্রহে কিছু গোলযোগ দেখা দেওয়ার দরুণ ডলফাস বেসের সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে.....

ডাঃ ভিকটর কার্টরাইট ডাঃ ওয়াংএর অবস্থা সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

ডলফাস বেসের ভাগ্য সত্যি খারাপ। স্পেস বোর্ড এখন বিবেচনা করছেন...

ভাগ্য কতটা খারাপ তা এমনিতেই পৃথিবীর টেলিভিশন দর্শকদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। আর আমরাও তো তখন বুঝিনি।

ততক্ষণে টেলিভিশনে শুরু হয়ে গিয়েছে এক সপ্তাহ আগে রেকর্ড করা আমার বক্তৃতা—

"……উনবিংশ শতাব্দীতে কিছু জ্যোতির্বিদদের ধারণা ছিল যে বুধ থেকে সূর্য্যের আরো কাছে আর একটি গ্রহ আছে। তাঁরা এই গ্রহ আবিষ্কারের আগেই এর নাম দেন 'ভালকান'। কারণ প্রাচীন রোমের দেবদেবীদের মধ্যে ভালকান ছিলেন আগুনের দেবতা—শুধু আগুন নয়, শিল্পে আগুনের ব্যবহারের দেবতাও বটে—ভালকানাইজড রবারের কথা তো জানেন। এইজন্যই সৌরশক্তি ব্যবহার করার এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় প্রোজেক্ট ভালকান। আর এই ভালকান-৪ উপগ্রহ, যার সাহায্যে সূর্য্যের আলো সৌরচুল্লীর ওপর ফোকাস্ করে ডলফাস বেসের জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে, সেটি বুধ আর সূর্য্যের মাঝামাঝি কাল্পনিক ভালকান গ্রহের মতই এক কক্ষপথে ঘুরছে। বুধ ঠিক ৮৮ দিনে নিজের অক্ষের উপরে এক পাক খায় আর ভালকান-৪ ও ৮৮ দিনে বুধের চার-দিকে এক পাক ঘোরে। কার্যতঃ এই উপগ্রহকে বুধ থেকে দেখলে সর্বদাই মনে হয় এটি বুধের চিরআলোকিত পৃষ্ঠে বিষুবরেখার ঠিক উপরে এক বিন্দুর উপর, বুধ ও সূর্য্যের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছে।

"কিন্তু ভালকান-৪ এর প্রধান অঙ্গ হলো একটি এক হাজার বর্গমিটার ধাতব আয়না—এটার সাহায্যেই সৌরচুল্লীর ওপর সূর্য্যের আলো ফোকাস্ করা হয়। আর সৌরচুল্লীটি বুধ গ্রহের যে অঞ্চলে রয়েছে তার নাম সাইনাস্ প্রোমেথেই। গ্রীক ভাষায় 'প্রোমেথিউস্' মানে 'দূরদর্শী' বা 'সন্ধানী', এবং গ্রীক প্রবাদের প্রোমেথিউস্ স্বর্গ থেকে প্রথম আগুন চুরি করে আনেন মানুষের জন্য। তেমনি এই সাইনাস্ প্রোমেথেইএর সৌর-চুল্লীও পথ দেখাবে সৌর শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি করার।

"বর্তমান এই সৌরচুল্লীতে সৌরশক্তি থেকে সোজাসুজি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাকে তার মারফৎ ডলফাস বেসে পাঠানো হচ্ছে। প্রোজেক্ট ভালকানের পরবর্তী ধাপ হল এই সৌরচুল্লীর সঙ্গে লেসার কনভার্টারি বসানো। এর সাহায্যে এক বিশাল পরিমানের সৌরশক্তিকে লেসার আলোকরশ্মিতে রূপান্তরিত করা যাবে। এই রশ্মিকে সহজেই বুধ থেকে পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব এবং এইভাবে সৌরশক্তির সাহায্যে পৃথিবীতে বিশাল পরিমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই প্রোজেক্ট ভালকানের উদ্দেশ্য।

"হিসাব করে দেখা গেছে যে ভালকান-৪ এর জায়গায় যদি দশ কিলোমিটার চাওড়া একটি আয়না বসানো হয় তবে তার সাহায্যে প্রায় ৫০ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।"

"বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অবধি আশা ছিল যে পৃথিবীর খনিজ তেল-কয়লা-ইউরেনিয়াম বিপদজনক ভাবে কমে আসার আগেই সমুদ্রের জলের ভারি হাইড্রোজেন থেকে পোষমানা হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই হাইড্রোজেন বোমাকে পোষ মানানোর কাজটা দেখা গেল গোড়াতে যতটা সহজ মনে করা গিয়েছিল ঠিক ততটা সহজ নয়। কিন্তু আগামী বিশ বছরের মধ্যেই পৃথিবী জোড়া এক বিদ্যুৎশক্তির দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।

"কাজেই প্রোমেথিউসের মতোই প্রোজেক্ট ভালকানের উদ্দেশ্য হলো সূর্য্যের আগুন কেড়ে নিয়ে"·····

হঠাৎ টেলিভিশন বন্ধ হয়ে গেল। এ কি, জানালার বাইরে ও কিসের আলো? আলো? আলো! বুধের চিররাত্রি অঞ্চলে এরকম খটখটে রোদ? এ কি অঘটন? এ কি প্রোমেথিউসের উপর আকাশদেব জিউসের কোপ? দপ করে সব আলো নিবে গেল! প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠলাম। জানালা দিয়ে বাইরে থেকে এক আলোর ঝলকা দেখা গেল। গ্যাস ট্যাঙ্ক ফাটলো নিশ্চয়ই। মাইনাস ১৫০° সেন্টিগ্রেডের জন্য তৈরী তরল অক্সিজেনের ট্যাঙ্কে রোদ পড়লে ভিতকার গ্যাসের চাপ বেড়ে যায়। আর তার ফলেই·····

এ্যালার্ম। ক্রিরিরিরিং····ক্রিরিরিরিং·····

ভিক্টর ঘুম থেকে উঠেই আঁতকে উঠলো—"একি? একি! সোম! সোম!··· আমি কোথায়? আমরা ডলফাসেই আছি? জানলা দিয়ে রোদ কোথা থেকে এল?"

—"কোথা থেকে এল পরে হবে। আগে তার ফলটা কি ভেবে দেখেছো?"

—"মানে?"

—"একটা বিস্ফোরণ হলো শুনলে ঘুমের মধ্যে?"

—"গ্যাস ট্যাঙ্ক ? সত্যি বলছো।"

—"এরকম উৎকট তামাসা করবো ভাবছো ? ফুয়েল সেলের কন্ট্রল প্যানেল দেখতে পারো—অক্সিজেন, মিথেন দুই শূন্য। ফুয়েল সেল পুরো অকেজো। তাই আলো নিভে গেছে, এয়ার পিওরিফায়ার আবার থেমে গেছে।"

—"মানে সারা বুধগ্রহে এই প্লাষ্টিক ডোমের ভিতরকার অক্সিজেন ছাড়া আর নেই ?"

—"শুধু তাই নয়। টেলিভিশন দেখছিলাম, সেটা থেমে গেল ওই বিস্ফোরণ হবার আগেই। তার মানে তাপে বড় ডিশ এরিয়ালের গ্রাহকযন্ত্র অকেজো। তাকে ঠাণ্ডা রাখার তরল হিলিয়াম গরমে উবে গেছে। মেরামতের কোনো উপায় নেই। পৃথিবী থেকেও আমাদের যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

—"কিন্তু দেখ ! দেখ ! এখন কি হচ্ছে ?"

—"আরে রোদ কমে আসছে। হলোই বা কি ? আবার সেটা থামলোই বা কেন ?"

হতবাক্ হয়ে আমরা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম —যেমন হঠাৎ রোদ আসার অসম্ভব ঘটনা ঘটেছিল, তেমনি আস্তে আস্তে রোদ কমে এসে একদম মিলিয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আকাশে তারার ঝাঁক আর ঝকঝকে শুকতারা ফিরে এল। যেন কিছুই ঘটে নি।

—"এ যে এক অলৌকিক ঘটনা। কিছু বুঝলে সোম ?"

—"খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। মাথাটা এখনো ঠিক খেলছে না। ভাববার চেষ্টা করছি।"

—"আচ্ছা, নিউক্লিয়ার ব্যাটারী চালু করলেও তো আমার এক্সপেরিমেণ্টের জীবজন্তুদের বিসর্জন দিতে হয় না ?"

—"হ্যাঁ। আশা করছিলাম সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। চালু কর ব্যাটারীটা।.....কি হলো ? হচ্ছে না তাহলে ?"

—"কণ্ট্রোল সার্কিটটা রোদে খারাপ হতে পারে। বেরিয়ে দেখতে হয়।"

—"চলো, দুজনেই যাই—আমি আমার চিড়িয়াখানার গতি করি।"

ততক্ষণে আমাদের দুজনের মনেই ভয় ঢুকেছে। আপাততঃ ডলফাসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস রয়েছে শুধু কয়েকটি সাধারণ ব্যাটারী—যাদের মেওয়াদ বড়জোর এক হপ্তা। চালু করতে না পারলে তো আমাদের আর আশা নেই।

স্পেস সুট পরে ঘর থেকে বেরোলাম। প্রথমেই যাই ব্যাটারীর দিকে। এই ব্যাটারী বা রিয়াক্টরে পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় তাপ থেকে সোজাসুজি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। একে চালু করতে হলে কতকগুলি কণ্ট্রোল রড বের করে নিতে হবে। আশা করছি শুধু রডগুলি বার করার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা অকেজো হয়েছে। তাহলে রডগুলিকে হাত ধরে টেনে টেনে বার করলেই সমস্যার সমাধান হবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে খালি হাতে কাজ করা কখনই আরামদায়ক নয়—এখনকার মত মরন-বাঁচন সমস্যা হলেও নয়। কিন্তু উপায় নেই, কারণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ নাড়াচাড়া করার বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি ডলফাসে নেই বলাই বাহুল্য।

যাই হোক। ভালো খবর—ব্যাটারী পুরো খারাপ হয় নি। তাপে খালি কণ্ট্রোল সিষ্টেমের সার্কিটগুলো নষ্ট হয়েছে। কণ্ট্রল রডগুলিকে প্রায় পুরোটা বার করে আটকে দিলে চলবে ঠিকই—আণবিকবিস্ফোরণের ভয় বিশেষ নেই—সে হিসাবে রিয়াক্টরের ডিসাইন ভালোই।

কোনো উপায় নেই। যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে আমাদের দুজনকেই প্রায় খালি হাতেই কাজটা করতে হবে। ব্যাটারী চালু না করতে পারলে আমাদের জীবনের মেয়াদ এক সপ্তাহ, কাজেই তেজস্ক্রিয়তার ভয় করার মানেই হয় না।

রোদের সমস্যাটার সমাধান করল ভিক্টর। আমি যখন ব্যাটারী মেরামত করতে শুরু করেছি তখন ও গ্যাস ট্যাঙ্কগুলোর ক্ষতির পরিমান পরীক্ষা করছিল। অবশ্য তাতে লাভ বিশেষ নেই—আমাদের বাঁচার একমাত্র আশা যখন হাজার কোটি টাকা খরচ করে পৃথিবী থেকে রকেট আসা তখন ট্যাঙ্কের ক্ষতির পরিমাণ দশ হাজার টাকা না দশ লক্ষ টাকা তাতে বিশেষ কিছু একটা এসে যায় না। সেই সময়েই ভিক্টর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—"সোম! দেখতো এটা ধূমকেতু না সুপারনোভা।"

—"কি বললে ?·····আকাশে ?·····সত্যি তো ! এতো উজ্জ্বল আশ্চর্য্য জ্যোতিষ্ক এলো কোথা থেকে ?"

—"তাই তো দেখাচ্ছি। তারা বা গ্রহ তো নয় বুঝতেই পারছো।"

—"ধূমকেতু বা সুপারনোভা হলে তো আগেই পৃথিবী থেকে খবর পেতাম। কি তবে ?"

—"আরে ! ভালকান-৪ ! রোদ আর তারা দুই সমস্যারই সমাধান এক সঙ্গে হয়ে গেল তাহলে ?"

—"ব্রাভো ! ভিক্টর, তুমি সত্যিই ভিক্টর। আর ছবিও তুলেছ তো ? তোমার তুলনা নেই !"

—"আরে, উচ্ছাস ছাড়ো তো। কি করবে তাই বলো না। এবার তো আলোটা ঠিক প্লাষ্টিক ডোমের ওপর পড়েনি তাই। প্লাষ্টিকের ওপর ঠিকমতো একবার ভালকান-৪ এর ফোকাস করা আলো পড়লে ভিক্টর-টিক্টর কোন ছার, পুরো ডলফাস বেসটাই তো নস্যাৎ হয়ে যাবে। একেবারে বাষ্পীভূত-রেগানের মতো।

তা মরতে যদি হয় তো এক সপ্তাহ ধরে আস্তে আস্তে দমবন্ধ হয়ে না মরে এক মুহূর্ত্তে বাষ্পীভুত হয়ে মরাই ভালো নয় কি ? বরং ততক্ষণে আর দু-চারটে ছবি-টবি তোলো।"

—"তা না হয় তুলছি। কিন্তু মতলবটা কি তাই বলো না ?"

—"মতলব ? মতলব আবার কি? ছবি-টবি কয়েকটা তুলে রাখলে ভবিষ্যতের মানুষ জানতে পারবে আমরা মৃত্যুদণ্ড পেয়ে শেষ কটা ঘণ্টা কিভাবে কাটালাম।"

—ওসব পাকামি রাখো তো। তুমি তো সিরিয়াস লোক ! মতলব না থাকলে তোমার মুখে অত হাসি দেখা যাওয়ার কথা নয়।

—এতো বুঝে ফেলেছো ? আর একটু তবে চিন্তা করো।

—ছাড়ো তো। না হয় দয়া করেই বলে ফেলো।

—বলবো বলছো ? তা আলোর কথাটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না কারণ ভালকান ৪ এর কক্ষপথ কখনো ডলফাসের দিগন্তের ওপরে ওঠে না

—ডলফাস বেসের সঙ্গে ভালকান ৪ এর যোগাযোগ হয় কেবলমাত্র ডলফাস জ্বালামুখের প্রাচীরের উপরে বসানো বিরাট ডিশ এরিয়ালের মাধ্যমে। এখন ভালকানকে দেখা গেল মানে কোনো কারণে উপগ্রহটি কক্ষচ্যুত হয়েছে। তারপর তো এখন সহজ কাজ—ছবিগুলো যে তুললে তার থেকে ভালকান কোন জায়গায় ছিল কয়েকটা সেট হিসাব করে কম্পুটারে ঢুকিয়ে দাও—ভালকান ৪এর নতুন কক্ষপথের হিসাব পেয়ে যাবে।

—কক্ষ পাল্টেছে বলে আগের বার যোগাযোগ করতে পারো নি, সে তো হলো। কিন্তু প্রেরকযন্ত্র ঠিক আছে কি? ভালকানের গ্রাহকযন্ত্র?

বললাম—প্রেরকযন্ত্র অল্প তাপে খারাপ হবার কোনো কারণ নেই।

—তাহলে তো আমরা পৃথিবীতেও খবর পাঠাতে পারি।

—পারিই তো! তাই তো আমায় এতো উৎফুল্ল দেখেছো। আর সৌরচুল্লী থেকে কেন তার মারফৎ কোনো সংকেত আসছে না সেটারও সমাধান হয়ে গেল—ওই ফোকাস করা আলো সৌরচুল্লী আর ডলফাসের মাঝ পথে কোথাও তার নষ্ট করে দিয়েছে।

ভিক্টর ছবিগুলো তুলেছিল ভাগগিস্। ছবিতে তারার পটভূমিকায় ভালকান ৪ কে নড়তে দেখা গেল। তা না হলে ভালকান ৪এর কক্ষের কোনো হিসাব পাওয়া সম্ভব হতো না। কম্পুটারে কক্ষের হিসেব ঠিকই হয়ে গেল। কিন্তু প্রেরকযন্ত্রকে চালু করা ঠিক অতটা সোজা হল না। ক্ষতি ছোট খাটো—তারের প্লাষ্টিক ইনসুলেশান গলে গিয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু তাই ঠিক করতেই প্রচুর সময় লেগে গেল। সর্বদা ভয়ে ভয়ে রয়েছি আবার যদি ভালকান ৪ এর ফোকাস করা আলো ডলফাসের ওপর এসে পড়ে। উপগ্রহটা কক্ষপথে যেতে যেতে যেরকম এলোমেলো ঘুরছে তাতে যে কোনো সময়ে এটা ঘটতে পারে, আগে থেকে জানার উপায় নেই। অবশ্য জানলেই বা কি করার আছে! হয়তো এরকম ঘটার হলে আগে থেকে না জানাই ভালো।

ভালকান ৪এ একটি ব্যবস্থা আছে যে একটি বিশেষ রেডিও সংকেত পাঠিয়ে তাকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। কিন্তু ভালকান ৪ যদি নিজেকে ধ্বংস করতে বিমুখ হয়? যদি এমন গোলযোগ থাকে যে জোরালো ধ্বংস করার সংকেত পাঠানো সত্ত্বেও উপগ্রহের বিশেষ গ্রাহকযন্ত্র কিছু কাজ না

করে? যে হপ্তা ছয়েক আমাদের ছোট নিউক্লিয়ার ব্যাটারী চলবে তার মধ্যে একবারও ফোকাস করা আলো ডলফাসের ওপর পড়বে না এমন আশা কম। ভালকান ৪ কে যদি ধ্বংস করা যায় সে যদি এইরকম এলোমেলো আলো ফোকাস করতে থাকে, তবে আমরা ক'দিন টিকে থাকতে পারবো কোনো স্থিরতা নেই।

শুধু পৃথিবীর টেলিপ্রিন্টার সংকেত মোটামুটি ঠিকভাবে ধরবার মতো একটা গ্রাহকযন্ত্র হলেই চলবে। তবে আগে তো ভালকান ৪এর সঙ্গে মোকাবিলা হোক—

প্রচণ্ড ভয় ধরে গিয়েছিল একবার যখন ডলফাস জ্বালামুখের কাছে প্রাচীরের ওপরটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল ভালকানের আলোতে। তখন প্রেরকযন্ত্র প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। কূলের কাছে এসে ভরাডুবি হবে নাকি শেষে? মনে প্রচণ্ড হতাশা এল, তাহলে কি পৃথিবীতে জানানোও গেল না ডলফাস বেসে কি ঘটলো? কিন্তু না, একটুর জন্য সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম আমরা, ফোকাস করা আলো জ্বালামুখের মেঝের ওপর চক্কর খেয়ে, ডলফাস বেসের এক কিলোমিটারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ওদিকের প্রাচীর পার হয়ে জ্বালামুখের বাইরে চলে গেল।

তবে এর পর ভালকান ৪ আর বিপদ ঘটাবার সুযোগ পায়নি। এমন কি তার ধ্বংস হবার দৃশ্যটাও ভিক্টরের ক্যামেরার টেলিস্কোপিক লেন্সে চমৎকার উঠেছে। পরের দু সপ্তাহে সেই ফিল্মটা বহুবার চালিয়ে দেখেছি—এক উজ্জ্বল আলোর কিন্দু ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ যেন এক ফুলঝুরি হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পৃথিবীতে আমাদের খবর পাঠিয়েছি। আমাদের উদ্ধার করার কিছু চেষ্টা হচ্ছে নিশ্চয়ই, আমরা জানতে উৎসুক, কিন্তু এক্ষুনি জানার কোন উপায় নেই। আবার বুধ এখন ঘুরে চলে যাচ্ছে সূর্যের যেদিকে পৃথিবী রয়েছে তার ঠিক উল্টোদিকে। এবার পাহাড়ে চড়ার কাজ। গ্রাহকযন্ত্র বসানো আছে জ্বালামুখের প্রাচীরের উপরে বড় ডিশ এরিয়ালের সঙ্গে। রোজ সেখানে চলে মেরামতির কাজ। গ্রাহকযন্ত্রটা দিন দশেকের মধ্যে তৈরী করতে না পারলে আরো এক সপ্তাহ পৃথিবীর কোনো সংকেত ধরা সম্ভব হবে না। কারণ পৃথিবী থেকে খবর পাঠাতে যত শক্তিশালী

প্রেরকযন্ত্রই ব্যবহার করুক না কেন, রেডিও প্রেরকযন্ত্র হিসাবে সূর্য তার লক্ষগুণ জোরালো। যখন বুধের আকাশে পৃথিবী সূর্যে কাছাকাছি অবস্থান করে তখন বুধ থেকে পৃথিবীর সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করা একেবারেই অসম্ভব। এমনিতেই পৃথিবী থেকে দশ কোটি মাইল পাড়ি দিয়ে আসা অত্যন্ত কমজোরী রেডিও তরঙ্গকে ধরতেই গ্রাহকযন্ত্রকে তরল হিলিয়ামে ঠাণ্ডা করা দরকার। হিলিয়াম চাই, কিন্তু হিলিয়াম নেই। আছে, বুধের চিররাত্রি অঞ্চলে কোটি কোটি টন জমাট বাঁধা হিলিয়াম আছে —আর তার মধ্যে থেকে লিটার পাঁচেক তরল হিলিয়াম পেলেই আমার কাজ চলে যেত। কিন্তু তা আর পাই কি করে? অগত্যা তরল নাইট্রোজেন দিয়েই কাজ সারতে হয়।

আমি আছি গ্রাহকযন্ত্র নিয়ে, এবং ভিক্টর আছে ওয়াংকে নিয়ে। ওয়াং রয়েছে একই রকম অজ্ঞান হয়ে—দশ দিন ধরে, খুবই চিন্তার বিষয়।

গ্রাহকযন্ত্রটা তৈরী শেষ হল। কসরৎ করে তাকে চালাতে পৃথিবীর সংকেত ধরা পড়ল। সূর্যের রেডিও তরঙ্গ প্রচণ্ড গোলমাল সৃষ্টি করছে। মেশিন টাইপ করে চলছে:

J *NSK* CKL *IN *DOL *UZS.....*ANS *Y *ALL **G HO *F *SS.....**AS*Y **LLI*G LFU*S.....

গ্রাহকযন্ত্র যদি বুঝতে পারে ভুল সংকেত আসছে তবে একটা তারা (*) ছাপে, অবশ্য তবু কিছু ভুল থেকে যায়। হ্যাঁ, বোঝা ঠিকই যাচ্ছে— Jansky calling Dolfuss,, স্পেস্ বোর্ডের জ্যানস্কী রেডিও ষ্টেশন থেকে ডলফাস বেসেকে ডাকছি। কিন্তু এতো ভুল সংকেত এলে তো তার থেকে কিছু বোঝা মুস্কিল—এটা এক কি সংকেত পেতে পারি আন্দাজ ছিলো বলেই বুঝতে পারলাম। আর এখন যেমন বুধ ক্রমশঃ সূর্যের উল্টোদিকে যেতে থাকবে, তেমনি সংকেতের ভুলের সংখ্যা তো উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। এখনই যখন এক একটা সূর্য্যের নয়েস্ বার্ষ্ট আসছে তখন তো এইরকম সংকেতও ঠিক পৌঁছচ্ছে না। কাজেই আমি উল্টে জ্যানস্কীকে বললাম প্রত্যেকটা অক্ষর পাঁচবার করে পাঠাতে।

আমার সংকেত যেতে দশ মিনিট, নতুন সংকেত আসতে দশ মিনিট। অধীর অপেক্ষায় রয়েছি, প্রায় পঁচিশ মিনিট বাদে নতুন সংকেত এলো

J*JJP/A*AA*/NNN*G/S*SS*/K*Z*K/YY*YY*CC-CC/A*H**/....

এ তো তবু মন্দের ভালো। কি বলছে জানা না থাকলেও অধিকাংশ সময়েই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব।

এইরকম সংকেতের আদান-প্রদান চললো টানা দুদিন ধরে, যতক্ষণ না সূর্য্যের উৎপাত এতো বেড়ে উঠলো যে আর যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হলো না। ভিক্টর আর আমি সর্বক্ষণ টেলিপ্রিন্টারের সামনে পড়েই রয়েছি। চাঁদের বিরাট জ্যানস্কী ডিশ এরিয়াল থেকে আমাদের সংকেত পাঠাতে প্রায় একটা ছোটখাটো শহরের সমান বিদ্যুৎশক্তি খরচ হচ্ছে। কিন্তু এই এগারো কোটি মাইল পথ পার হয়ে আমাদের জোড়াতালি দেওয়া গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়তে সেই সংকেতের কিছু আর প্রায় বাকি থাকছে না। আদৌ কোনো সংকেত যে পাচ্ছি তাতেই আমাদের কৃতার্থ হওয়া উচিত।

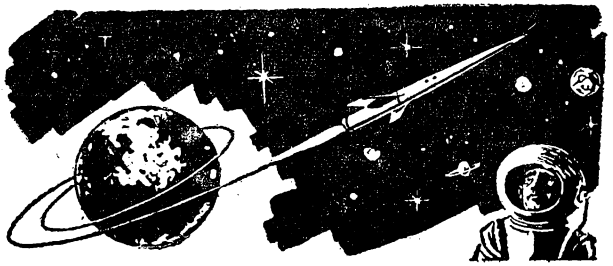

পৃথিবী থেকে আমাদের উদ্ধার করতে আসছে সর্বাধুনিক স্পেসশিপ গাডার্ড। আণবিক শক্তি-চালিত আয়ন রকেট। সোজা পথে, ক্রমাগত ত্বরণ করে, সূর্য্যের কান ঘেঁষে এই রকেট তিন সপ্তাহের মধ্যেই বুধে পৌঁছে যাবে। স্পেসশিপ গডার্ড শিপই বটে! এই মহাকাশযানে কুড়ি জন অবধি লোক ধরে এবং তাদের কাজ করার যা জায়গা রয়েছে তা অন্ততঃ

কলম্বাসের এক একটা জাহাজে যা ছিল তার বেশী। তার মধ্যে একটা ল্যাবরেটরীকে এই যাত্রার জন্য অপারেশন থিয়েটারে পরিণত করা হয়েছে। ওয়াংকে গডার্ডে তুলবার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিস্কে অস্ত্রোপচার করা সুরু হবে—ডাক্তার, নার্স সব তৈরী রয়েছে। এই হবে মহাকাশে প্রথম মস্তিস্কে অস্ত্রোপচার। মঙ্গলে অবশ্য এরকম অস্ত্রোপচার হয়েছে, আর স্পেস্‌শিপে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ জাতীয় অপারেশন ও আজকাল হর্দম হচ্ছে —তবু পৃথিবীতে ওয়াংএর অপারেশন নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে মনে হলো।

গাডার্ড আসতে ১৮ দিন, সাড়ে তিন কোটি কিলোমিটার।

প্রোজেক্ট ভালকান অকেজো। আমার আর কিছু করার নেই। কিছুতেই ডলফাসের মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরীর কোনো বইতে মন বসাতে পারছি না। আমাদের তিনজনের জন্য প্রায় দশ হাজার ফিল্মের লাইব্রেরী, তার মধ্যে আবার হাজার খানেক বাছাই করা গল্পের বই, মানে ঠিক বই নয়—থ্রি-ডি রঙীন টেলিভিশনের হোলো গ্রাম ফিল্ম। দশ বছর আগেও তো এই রকম একটা লাইব্রেরী পুরো নিজের ব্যবহারের জন্য পেতে পারি ভাবতেই পারতাম না। গত বছরেও তো সমস্ত অবসর সময়ে এই লাইব্রেরীতে পড়ে থাকতাম। কিন্তু এখন? ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। এর চেয়ে বরং ওই মেরামতির কাজ ভালো ছিল। তখন একটা উৎকণ্ঠা ছিলো—কিন্তু সেই সঙ্গে করবার কাজেরও তো অভাব ছিল না।

বার দিন, সাড়ে তেরো কোটি কিলোমিটার। গজর্ডের গতিবেগ এখন ক্রমাগতঃ বাড়ছে। এখন ঘণ্টায় চার লক্ষ কিলোমিটার, এক সপ্তাহ বাদে সূর্য্য পেরিয়ে গতিবেগ হবে প্রায় ঘণ্টায় দশ লক্ষ কিলোমিটার বা সেকেণ্ডে তিনশো কিলোলিটার।

ভালকান ৫ পৃথিবীতে তৈরী হচ্ছে, কিন্তু বুধে আসতে বছরখানের লাগবে। কাজেই বছরখানেক প্রোজেক্ট ভালকানের কাজ নেই। গবেষণা-গারের কাজ আছে অবশ্য। তবে দশ বছর মহাকাশযাত্রার সীমান্ত প্রদেশে রয়েছি, এরপর গবেষণাগারের কাজে ফিরে যাওয়া শক্ত। হতে পারে এক পৃথিবীতে, চাঁদে নয়। পৃথিবীতে ফিরবো? ঘুরে ফিরে ওই

একই প্রশ্নে এসে ঠেকে। এক্ষুনি মনস্থির করা সম্ভব নয়, কিছু মনস্থির না করে স্বস্তি পাচ্ছি না।

আর প্রোজেক্ট ভালকানকে তো এক্ষুনি জলাঞ্জলি দিতে পারি না, এখনও তো আমি ডলফাস বেসের নেতাই রয়েছি। যদিও আর শুধু দু সপ্তাহ গডার্ডকে বুধ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, কারণ সূর্য্যের এতো কাছ দিয়ে আসতে গডার্ডের লোকেরা যে রেডিয়েশান খাবে তার চিকিৎসা করতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চাঁদে ফিরে যেতে হবে। তখন তাড়াহুড়োতে হয়তো সৌরচুল্লীতে সংগৃহীত ভালকান ৪ ও রেডিও টেলিস্কোপগুলির তথ্যের টেপগুলি আনার সময় হবে না। কিন্তু টেপের মধ্যেই সম্ভবতঃ লুকিয়ে আছে ভালকান ৪ এর গোলযোগের কারণের ঠিকানা। নিয়ে আসবো গিয়ে? এমনিতেই এরকম বিপদ, আবার অযথা ঝক্কি নেওয়া কি উচিত? একা গিয়ে কোনো বিপদে পড়লে কি হবে?

গডার্ডের আসতে ছয় দিন, সে এখন সাড়ে ছয় কোটি কিলোমিটার দূরে।

নিউক্লিয়ার ব্যাটারীর অবস্থা ভালো নয়—দুবার ভোল্টেজ এতো কমে গিয়েছিল যে এয়ার পিওরিফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। গডার্ড এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের উদ্ধার করবে জানি তাই, তা না হলে এটা খুবই চিন্তার কারণ হত। গত কয়েক দিনের মধ্যে না পৃথিবী, না গডার্ড—কারুর সঙ্গেই সংযোগ নেই আমাদের। হবার আশাও নেই, পৃথিবী এখন সূর্য্যের ওপারে; আর গডার্ড সূর্য্যের এক কোটি কিলোমিটারের মধ্যে, সূর্য্যের এতো কাছে কোন মহাকাশযান আগে কখনো যায় নি। অবশ্য গডার্ড কোথায় আছে তা বলছি শুধু জ্যানস্কী থেকে তার পরিকল্পিত কক্ষপথের যা হিসাব পেয়েছিলাম তার ভিত্তিতে। কারণ গডার্ডের কমজোরী প্রেরকযন্ত্রের সংকেত আমরা শুনতে পাবো তখনই, যখন সে বুধের কয়েক লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পৌঁছবে।

গডার্ডের চার দিন, আড়াই কোটি কিলোমিটার। নিউক্লিয়ার ব্যাটারী গণ্ডগোল শুরু করায় এয়ার পিওরিফায়ার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অক্সিজেন সিলিণ্ডার সব নিয়ে অক্সিজেন আছে নয় দিনের মতো। গডার্ডের আসতে যদি এক সপ্তাহ দেরী হয়? তা হবে না, হয় চার দিনেই পৌঁছবে,

নয়তো, তেমন কিছু গোলমাল হলে চার মাসেও পৌঁছবে না। আমাদের কাছে অবশ্য ছ দিনের দেরী কি ছয় শতাব্দীর দেরী একই কথা।

বসে থাকা অসহ্য। সৌরচুল্লীর কাজ সেরে আসি। আমার জোরালো যুক্তি—চার সপ্তাহ আগে ওয়াং আর আমি যখন শেষবার চিরআলোকিত অঞ্চলে গিয়েছিলাম তখন ওই তথ্যের টেপগুলো আনা হয় নি। দু মাসের টেপ জমে রয়েছে। এ্যান্টিনিয়াডি অবধি যাব না, সৌরচুল্লী তো মাত্র দু ঘণ্টার পথ।

—দেখ, এখন বুধের গ্রীষ্ম। তুমি চিরআলোকিত পিঠে যদি ছয় ঘণ্টাও থাকো, আর তার মধ্যে কোনো সৌর ঝড় হয়—তাহলে সূর্যের রেডিয়েশনে তোমার শরীরে যা ক্ষতি হবে তা ঠিক করা আমার চিকিৎসায় কুলোবে না।

—সৌর ঝড় হলে তুমি রেডিওতে আমায় সাবধান করে দিও।

—না আমার কিন্তু তোমার এই একগুঁয়েমী মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

—আরে, সব সময়ে অতো স্পেস রেগুলেশনের প্রতিটি নিয়ম মেনে চললে কি চলে?

—কিন্তু গোঁয়ার্তুমি কোরো না। ট্র্যাক্টরের অক্সিজেন তো ডোমে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে,—বাড়তি অক্সিজেন সিলিণ্ডার নাও তো।

—আর এই পাঁচ-সাত ঘণ্টা সুটের অক্সিজেনেই চলে যাবে।

—না! সে হতে পারে না। আর যাই করো বাড়তি অক্সিজেন তোমাকে নিতেই হবে। যদি ব্রেকডাউন হয়।

—সে সম্ভবনা নেই।

—না। অক্সিজেন তো নাও। এই শেষ সপ্তাহে শুধু শুধু একটা কিছু কাণ্ড ঘটিয়ে লাভ কি?

ভরা গ্রীষ্ম। সূর্য্য দেখাচ্ছে পৃথিবীর সূর্য্যের এগারো গুন বড়। ট্র্যাক্টরের সামনের অংশের তাপমাত্রা চর চর করে ৬০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠে গেল। অবশ্য পৃথিবীর হাওয়া আপিসের মতো ছায়ায় তাপমাত্রা মাপতে গেলে এটা দেখাতো ০°রও কম। তবে ৬০০ ডিগ্রী এই বিশেষ ভাবে তৈরী ট্র্যাক্টরের পক্ষেও বেশীক্ষণ সহ্য করা মুস্কিল।

সৌরচুল্লীতে পৌঁছলাম। ঘুরে দেখছি। টেপ বার করছি। বেশ লাগছে। বছর দুই আগে এই সৌরচুল্লী তৈরীর কাজের মধ্যেই তো আমি ছিলাম—পৃথিবীতে তৈরী করে, ছোট ছোট অংশে ভাগ করে, আবার বুধে এনে এই বিরাট যন্ত্রটাকে জোড়া লাগানো হয়।

কয়েকবার মনে হলো ছোটখাটো ভূমিকম্প হচ্ছে। প্রথমে ভাবছিলাম কল্পনা। বুধে বড় ভূমিকম্প হয় না—মানে পৃথিবীর তুলনায় বেশী, তবে ধর বৃহস্পতির তুলনায় কিছুই না। আর অধিকাংশ ভূমিকম্পই হয় চির-আলোকিত পিঠের বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে, ডলফাসে তা যন্ত্রে ধরা পড়ে, তাছাড়া বিশেষ বোঝা যায় না।

তারপর হঠাৎ দেখলাম যেন খোদ সূর্য্যই ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। কি! কি??·····সৌরচুল্লীর মধ্যে ছায়ায় নীচু হয়ে একটা যন্ত্র পরীক্ষা করছিলাম। উঠে ছায়া থেকে বেরিয়ে, সূর্য্যের দিকে চাইলাম। নাঃ, কিছু নেই তো। আমি পাগল? না, এত যুক্তি দেখিয়ে কোনো পাগল কি নিজেকে পাগল প্রমাণ করে?

আমার মানসিক অবস্থা কি সত্যিই সুস্থ নয়? সেই ভেবেই কি ভিক্টর আমায় আসতে বারন করছিল? এইরকম এলোমেলো দেখতে শুরু করলে ডলফাস অবধি নিরাপদে ট্র্যাক্টর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো? হয়তো পাগল হইনি কিন্তু জেট পাইলটদের একা চালাতে চালাতে যেমন ভার্টিগো হয়—হঠাৎ মনে হয় আকাশটা মাটি, মাটিটা আকাশ, কখনো কখনো উল্টো করে প্লেন চালাতে শুরু করে। হয়তো সাইনাস প্রোমেথেই-এর উপরেই চক্রাকারে ট্র্যাক্টর চালাতে শুরু করবো—চক্করের পর চক্কর—গোল হয়ে, একই জায়গায়। খুব আশ্চর্য্যের কিছু নেই। ৬০০° সেঃ। বাপ! আর গত মাসটা যা ধকল গেছে।

কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সন্দেহে অবকাশ রইলো না। সোজা উত্তর-দিকে তাকিয়ে ছিলাম ট্র্যাক্টরে বসে,—চোখের সামনে, তাজ্জব কি বাত, সূর্য্য ফ্যাকাশে হয়ে এলো। ছবি তোলার দরকার এরকম ঘটনায়—বুধ-গ্রহের বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার হতে পারে। এবার আন্দাজ কুড়ি সেকেণ্ড সূর্য্যটা ফ্যাকাশে হয়ে ছিল, ক্যামেরাটা বার করতে করতেই যে কে সেই।

ভিক্টরকে রেডিওতে রিপর্ট। তারপর ক্যামেরা হাতে প্রতীক্ষায় রইলাম আবার কখন হয়·····ভাবছি কি হতে পারে। বুধের বায়ুমণ্ডলেই কিছু হবে, সূর্য্যের এরকম হঠাৎ কিছু হতে পারে না। অবশ্য আইস্ এজ (যখন পৃথিবী বরফে ঢেকে গিয়েছিলো—ইয়োরোপ আমেরিকার ওপর ছিল তিন কিলোমিটার পুরো বরফের আস্তরন) কেন হয়েছিল বোঝাতে গিয়ে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেছেন যে সূর্য্যের আলো হয়তো কমে এসেছিল। কিন্তু কুড়ি সেকেণ্ডের জন্য? পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হলে তবু কথা ছিল, বায়ুমণ্ডল তো নেই বললেই চলে, তার মধ্যে এমন কি ঘটবে যে সূর্য্যের আলো কমে আসবে? বোঝা দুষ্কর। দ্বিতীয় বার ও ভুল দেখি নি তো? ঘটনাটা এমন যে বিশ্বাস করা শক্ত।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আবার। অন্যমনস্ক ছিলাম, তবে এবারকার ঘটনাটা আরো জোরালো, আরো বেশীক্ষণ ধরে চললো। ছবি তুললাম, কিন্তু ছবিতে কি উঠলো এক্ষুনি তো জানতে পারছি না—আর করার আছে কিছু? আচ্ছা,·····এ্যাণ্টনিয়াডি পর্বতশ্রেনী ঠিক ওই সূর্য্যের দিকেই তো—দিগন্তের ওপারে, চোখে পড়ে না। আচ্ছা, আগ্নেয়গিরিটা? ঠিক, মানচিত্রে দেখি তো·····হ্যাঁ। যা ভেবেছি। একটু নিরাশ হতে হয়। সমস্যাটার সমাধান হলো, তবে নতুন কিছু আবিষ্কারের আশাও ঘুচে গেল সেই সঙ্গে। এমন অগ্নুৎপাত হচ্ছে যে প্রচুর সংখ্যায় ছাইএর কণা আকাশে ছিটকে উঠে সূর্য্যকে আড়াল করছে।

বাড়তি অক্সিজেন তো আছেই, দেখে আসি কেমন অগ্নুৎপাত হচ্ছে। অল্প কয়েকটা ছবি তুললেও ভূতত্ত্ববিদদের যথেষ্ট গবেষণার খোরাক হবে, কারন ওই আগ্নেয়গিরিটার বিষয়ে প্রচুর তথ্য তো সংগ্রহ করাই আছে। গত সপ্তাহের টেপগুলো কি আনা সম্ভব এ্যাণ্টনিয়াডি পাহাড়ের মাথা থেকে? মনে হয় না—এরকম অগ্নুৎপাতের মধ্যে আগ্নেয়গিরির পাশের পাহাড়ে ওঠা হবে, বেশী ঝুঁকি নেওয়া অনুচিত।

রওনা হলাম সাইনাস্ প্রোমেথেই পার হয়ে। আরো দুবার ওই রকম সূর্য্য ঢেকে গেল। এ্যাণ্টনিয়াডি রেঞ্জের পাহাড়গুলো এবার কাছে আসছে। ছবি তোলার মতই দৃশ্য বটে, সিনে ক্যামেরাটা চালু করলাম।

প্রান্তরের সমস্ত পাহাড়ের ছায়া ঢাকা অংশ জুড়ে গনগনে লাল

লাভা। লাভাকে কয়েকশো মিটার দূরে রেখেই থামলাম। পূর্বে পশ্চিমে ঘুরে দেখলাম, ছবি তুললাম। এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লাভাস্রোত কি হারে এগোচ্ছে পর্যবেক্ষণ করলাম। ফেরার কথা ভাবছি……

—ব্যাপারটা ঘটলো হঠাৎ, পূর্বাভাষ না দিয়ে। আর এতো সামান্য ভাবে শুরু হলো যে গোড়ায় তার গুরুত্বও ঠিক বুঝতে পারি নি। সবে ফিরবো কিনা ভাবছি, এমন সময়ে লক্ষ্য করলাম ট্র্যাক্টরটা ঠিক সোজা চলছে না। স্টিয়ারিং হুইল একটু বাঁয়ে টেনে চালাচ্ছি না হয়—মিনিট পনেরো এরকম চালিয়েছি। ডলফাসের দিকে ফিরতে শুরু করেছি। কিন্তু বেশী দেরী হয়ে গেছে। একটা মিটার খানেক গভীর খানা। এরকম খাদ ট্র্যাক্টরের স্বচ্ছন্দে পার হওয়া উচিত. এরকম খানা-খন্দ এই ট্র্যাক্টরেই বহুবার পার হয়েছি। কিন্তু এবারকার অবস্থার একটু তফাৎ ছিল।

এবার খানায় নেমে ট্র্যাক্টর আটকে গেল। কিছুতেই ওপারে উঠল না, মুখ নীচু করেই পড়েই পড়ে রইল। এই ৬০০° তাপমাত্রায় চলে সেও যেন ক্লান্তি বোধ করছে, নড়াচড়া করার শক্তি নেই। ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে, ব্যাক করে, সামনে চালিয়ে, অনেক কসরৎ করলাম। মনে ভয় ধরে এলো। ভাবলাম এবার ইঞ্জিন পুরোদমে চালিয়ে এস্পার ওস্পার একটা কিছু করে ফেলতে হয়। হলোও তাই। হঠাৎ ডানদিকের ট্র্যাকের লোহার শিকল ছিঁড়ে কন্ট্রল হারিয়ে উল্টে পড়ল ট্র্যাক্টরটা।

খেয়াল হলো ব্যাটারীর ট্যাঙ্ক ফেটে গন্ধক গড়িয়ে পড়ছে। এয়ার লক আটকে গিয়েছে, কি করে বেরাবো? গন্ধক একটু সহ্য করা যেতে পারে, এই স্পেস্ সুট তো ৬০০° সেঃ সহ্য করার জন্যই তৈরী। কিন্তু সালফার পটাশিয়াম ব্যাটারী আছে এই বৈদ্যুতিক ট্র্যাক্টরে। এবার যদি তরল পটাশিয়াম গড়াতে শুরু করে? তাহলেই তো গেছি! স্পেস্ সুটের স্টেনলেস্ ষ্টীলেই তো ফুটো হয়ে যাবে তাতে। ট্র্যাক্টরটাই আমার কফিন হয়ে যাবে। জানলার কাঁচ! টর্চ দিয়ে ঠুকছি, ঠুকছি……ভাঙ্গা সোজা নয়। আরেকটু হলে ঘুঁষি মারতে শুরু করছিলাম, না বুদ্ধিভ্রম হলে চলবে না। আচ্ছা, অক্সিজেন সিলিণ্ডারটাই তো আছে! সিলিণ্ডারের তলার গোল অংশের জোর আছে—গায়ের জোরে মারি কাঁচের ওপর। ফেটেছে, ফেটেছে……

দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার শুদ্ধ নিজেকে বার করে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল। দুর্ঘটনা হয় এমনি গোঁয়ার্তুমি করার জন্য, অথবা ওয়াংএর মতো অসাবধান হওয়ার জন্য—এই ট্রেন কি প্লেন দুর্ঘটনাও যে জন্য ঘটে আরকি। তবে পৃথিবীর বাইরে পরিবেশ আরো বিপদসঙ্কুল, তাই অল্প ভুলের কড়া শাস্তি।

ট্র্যাক্টরের ব্যাটারীর গন্ধক নষ্ট হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ নেই ট্র্যাক্টরে, রেডিও ঠিক থাকলেও ভিক্টরের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় নেই। স্পেস্ সুটের রেডিওর দৌড় কম—তা দিয়ে এই ৩০০ কিলোমিটার পাল্লায় সংকেত পাঠানোর কথাও ভাবাও বাতুলতা।

হাঁটতে শুরু করলাম। দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার পিঠে--প্রায় আশি ঘণ্টার মতো অক্সিজেন আছে। পুরো ধরাচূড়ো নিয়ে আমার ওজন পৃথিবীতে চারশো কিলোগ্রামের কিছু বেশী হবে, এতো জিনিষ নিয়ে চলাফেরা করা বুধেও ঠিক ছেলেখেলা নয়। তবে অল্প মাধ্যাকর্ষনে তাড়াতাড়ি হাঁটা তো বহুকাল অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন বরং পৃথিবীতে ফিরলেই মুস্কিলে পড়তে হবে। আশি ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার হাঁটা—অসম্ভব নয়, তবে সহজ তো নয়ই। তবে অবশ্য অক্সিজেন সিলিণ্ডার গুলো তো শেষ হলে মাঝপথে ফেলে যেতে পারবো।

গডার্ডের আসতে তিন দিন।

প্রথম দিন মনের জোর ছিল হাঁটতে হাঁটতে আবার কতবার সূর্য্য আবছা হচ্ছে খেয়াল করছিলাম। আমার হাঁটা, ডলফাস বেস, গাডার্ডের আসা আর জ্যানস্কীর সংকেতের কথা ভাবছিলাম—বুকের ডসিমিটারটা মাঝে মাঝে দেখছিলাম। ভাবছিলাম ভালকান-৫ কবে তৈরী হবে।

সাইনাস্ প্রোমেথেই এর মাঝামাঝি পৌঁছিয়েছি। চারদিকে ধূ-ধূ প্রান্তর। পিছনে না দেখা যায় এ্যাণ্টনিয়াডি পর্বশ্রেনী, সামনে না দেখা যায় ডলফাস জ্বালামুখের প্রাচীর। অবশ্য দিক বুঝতে কোনো মুস্কিল নেই —ডলফাস জ্বালামুখ প্রায় ঠিক দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত, আর সূর্য্য তো এখানে সব সময়েই উত্তর দিকে, আকাশের একই জায়গায়। কাজেই সূর্য্যকে পিছনে রেখে নিজের ছায়া বরাবর হাঁটলেই হলো। বুধে চৌম্বক

মেরু আছে, তবে সৌরঝড়ে চৌম্বকক্ষেত্র সর্বদাই এলোমেলো হয়ে থাকে, কোনো কাজে দেয় না।

প্রায় যন্ত্রের মতো হাঁটছিলাম। থামলাম দশ ঘণ্টা পর—একটা টিলার পিছনে। ছায়ায় শুয়ে পড়ে মনে হল আর নড়বার শক্তি নেই।

ঘুম ভাঙ্গল যখন তখনও প্রায় একই অবস্থা—হাঁটু মুড়তে ব্যথা লাগছে, কোমরে যেন বাত। গডার্ডের দুদিন, অক্সিজেনের ষাট ঘণ্টা। একটা সিলিণ্ডার ফেলে আবার হাঁটা শুরু। হাঁটার গতিবেগ গতকালের অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছে, ডলফাসের পৌঁছতে পারবো কিনা সন্দেহ। গতকাল বোধ-একশো কিলোমিটারের বেশী পার হয়েনি, কিন্তু শরীরের অবস্থা যদি এই হারে খারাপ হতে থাকে! তবে হাঁটা থামানো চলে না—চলেনি, মাঝে মাঝে একটু ঝিম এসে যাচ্ছে; থেমে যাওয়ার, শুয়ে পড়ার, হাল ছেড়ে দেওয়ার দুর্দম ইচ্ছা দমন করে হেঁটে যাচ্ছি।

শুধু ধূ ধূ প্রান্তর, জ্বালামুখের খাবলা ওঠা, আর দু-চারটে টিলা। নতুন কিছু নেই। কতদূর এলাম তার কোনো মাপ নেই। মাথায় নানান চিন্তা ঘুরছে। রেজা আর আমি রেজার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছি. রেজার ট্যাঙ্ক থেকে ফুটো দিয়ে অক্সিজেন বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি হেঁটে হেঁটে অক্সি-জেন শেষ করছি। আমি প্রোমেথিউস্—কিন্তু প্রোমেথিউস্ যা পেরেছিল, সূর্য্যের আগুন কেড়ে আনতে, তা আমি পারি নি। আকাশের দেবতা জিউসের রোষে প্রোমেথিউস্ বাঁধা ছিল এ্যাটলাস্ পাহাড়ের গায়ে। আর তার যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত দুটো শকুন। রোজ রাত্রে যকৃৎ নতুন করে গজিয়ে উঠতো। মরবার পর্য্যন্ত হুকুম ছিল না প্রোমেথিউসের, তবে আমার সুবিধা তিপ্পান্ন ঘণ্টার অক্সিজেন আছে। এর মধ্যেই একটা কিনারা হয়ে যাবে।

আমি শুরু করেছি পৃথিবী থেকে—সোম, মঙ্গল, বুধ সপ্তাহটা আর শেষ হতেপারবে না, একেবার এক্ষুণি রবি তা কেন হবে? হওয়া উচিত নয়। কিন্তু হচ্ছে তো। হাঁটা ছাড়া আর কিছু করার নেই তাই হাঁটছি। এইবার খিদের জ্বালা কাকে বলে একটু একটু মালুম হচ্ছে। জল আছে স্পেস্সুটের মধ্যে, কিন্তু খাবার নেই। চল্লিশ ঘণ্টা পেটে কিছু

পড়ে নি। এবার আর দশ ঘণ্টাও হাঁটা গেল না একটানা।

স্পেসস্যুট শুদ্ধ শোয়া, আরামদায়ক বিছানা নয় বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্তি, আশা ছিল ক্লান্তিতেই ঘুম হবে। কিছু হচ্ছে না—ঘুমও হচ্ছে না। ঘুম হচ্ছে ছাড়া ছাড়া, মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম এর মধ্যে একরাতের ঘুম হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হল না কি আর করা যায়? আবার হাঁটো।

অর্দ্ধেকের বেশী পথ কাবার করেছি। চুয়াল্লিশ ঘণ্টার অক্সিজেন, গডার্ডের আসতে দেড় দিন। হাঁটছি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—এও এক দুঃস্বপ্ন। দশ ঘণ্টা আগেও যখন হাঁটছিলাম, মনে নানান দুশ্চিন্তা ঘুরছিল, এখন মনে হচ্ছে সেই ছিল ভালো। এখন মন যেন মরে গিয়েছে। শরীরের সাড় নেই, ব্যথা-বেদনা নেই— যন্ত্র। সেই যন্ত্রেরও এই বিকল হয়ে আসার পূর্বমুহূর্ত্ত। চিন্তার ক্ষমতা নেই। মস্তিষ্কের সেরিব্রাম অবশ। খালি তাণ্ডব সেরিবেল্লামের তাগিদেই হেঁটে চলেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার। হোঁচট খাচ্ছি, ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটা ছাড়া জীবনে আর কিছু করেছিলাম আস্তে আস্তে তা ভুলে যাচ্ছি। জন্মে অবধি হাঁটছি। আরো আটত্রিশ ঘণ্টা হাঁটবো।

সারা শরীরে যন্ত্রণা। দাঁড়াতে পারছি না। শেষে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম। কুড়ি ঘণ্টা ঘুম হয়নি। প্রচণ্ড শ্রান্তি। একটা টিলার ছায়ায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ডলফাসে পৌঁছানোর আশা নেই।

ঘুম ভেঙ্গে দেখি বাঁ পায়ের উরু নাড়াতেই ব্যথা লাগছে। একশো কিলোমিটার হামাগুড়ি দেওয়ার কোনো ম্যারথন রেস হবে কিনা জানি না। হলেও, সুস্থ শরীরেই তিরিশ ঘণ্টায় সেই রেস কেউ জিততে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে হাঁটু ভাঙ্গা অবস্থায়, আড়াই দিন না খেয়ে হাঁটার পর অন্ততঃ কেউ যে তিরিশ ঘণ্টায় সেই ম্যারাথন জিততে পারবে বিশ্বাস হয় না।

শরীরে যা শ্রান্তি, হাঁটু ঠিক থাকলেই ত্রিশ ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার হাঁটতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

হাঁটুটা গেল একটু খারাপ সময়ে। "একটু খারাপ সময়ে?"

—Under statement of the year, অসম্ভব কমিয়ে বলা। ওই ডলফাস জ্বালামুখের প্রাচীরের চূড়োগুলো দেখা যাচ্ছে দিগন্তের কাছে। সৌরচুল্লী সম্ভবতঃ পেরিয়ে এসেছি।

এখন মনে হচ্ছে ট্র্যাক্টরের কাছে থাকলেই ভালো করতাম। গডার্ড হয়তো আর আঠারো কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে। ভিক্টরের কাছ থেকে আমার কথা জেনে ক্যামেরা দিয়ে খুঁজবে সাইনাস প্রোমেথেই এর প্রান্তর। সূর্য্যের তাপ প্রতিফলন করায় ট্র্যাক্টরের ধাতব গা আয়নার মতো চকচকে। ছবিতে তা ধরা পড়তে বাধ্য। কিন্তু একটা মানুষ, দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার প্রান্তরে—এর চেয়ে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা সত্যিই সহজ। করা যেত এক মাটি খুঁড়ে কোনো রকম চিহ্ন তৈরী করা……ইস্! শরীরটা আরেকটু সুস্থ থাকতে একবার ও খেয়াল হলো না, এমন ভুলও মানুষে করে! মিটার খানেক চওড়া দাগ কেটে যদি মিটার দশেকের হরফে sos জাতীয় কিছু লেখা হয় তবে গডার্ড থেকে তা চোখে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এখন? দু-চার মিটার নড়তেই এখন মনে হচ্ছে পা টা যেন ছিঁড়ে গেল। আর একশো মিটার দূরে রোদ। রোদে গিয়ে শুয়ে থাকলেও হয়তো স্পেস সুটের রঙ গডার্ডের চোখে পড়তো। কিন্তু শরীর মাথার সঙ্গে বেইমানী করছে, কোমর হতে নীচের দিকটা পুরো অবশ।

আশা নেই। মন তবু মানতে চায় না। একটা অল্পজোরী, ছোট রেডিও; আর ওদিকে আকাশে বিশাল সূর্য্য এই রেডিওর লক্ষ কোটি গুণ তরঙ্গ উদ্ধারন করছে। তবু ভাববার বিষয়। যদি রেডিওটা দিয়ে কোন রকমে খবর দেওয়া যায়—অক্সিজেন ফুরোবার আগে জানানো যায় এই সম্ভাব্য দশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কোন বিন্দুতে আছি।

অক্সিজেনের মেয়াদ আর আঠাশ ঘণ্টা। ধরি গডার্ড পৌছবে কুড়ি ঘণ্টা বাদে। ইস্, আর একদিন, দশটা ঘণ্টাও যদি থাকতো! গডার্ড তো বুধে নামবে না, কক্ষ পথেই ঘুরতে থাকবে। শাট্‌ল্ রকেট নামবে ভাঙ্গা ট্র্যাক্টরের কাজে, হয়তো একটা ট্র্যাক্টর নামিয়ে আমার পিছু নেবে। কিন্তু সময় লাগবে যে, আর সময়েই তো নেই। ঠিকই আমার কাছে

পৌঁছবে, কিন্তু কখন ? ট্র্যাক্টরে প্রায় দুশো কিলোমিটার আসতে হবে ফুলস্পীডে চালালেও লাগবে ঘণ্টা চারেক, কিন্তু তাতো করতে পারবে না। পায়ের ছাপ দেখে দেখে আসতে সাত আট ঘণ্টা লাগবে। তার উপর আবার মাঝ পথে নিশ্চয়ই দুচারবার পথ হারিয়ে ফেলবে—আবার আমার পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে করতে সময়ও তো যাবে।

নূন্যতম কত সময় লাগতে পারে ? ধরলাম গডার্ড পৌঁছাবে পনেরো ঘণ্টার মধ্যেই—ভিক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলো, সাইনাস্ প্রোমেথেই এর ছবি তুললো, তাকে ডেভলাপ্ করলো, মাইক্রোস্ক্যানারে পরীক্ষা করলো, ট্র্যাক্টর কোথায় দেখলো, তারপর সেখানে নামলো—সব নিয়ে আট ঘণ্টা তো বটেই। তারপর আসতে আরো দশ ঘণ্টা—তার তিন ঘণ্টার বেশী আগেই তো অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর এই একত্রিশ ঘণ্টাও বড্ড কম ধরা হয়েছে— পঁয়ত্রিশ চল্লিশ ঘণ্টা ধরলেই ঠিক হয়। আর অক্সিজেনের আঠাশ ঘণ্টার হিসাব প্রাণের শেষ স্পন্দনটাকে ইলাষ্টিকের মতো যতদূর সম্ভব টেনে ধরার হিসাব। একে আর বাড়ানো একেবারেই অসম্ভব।

একটু ঘোর এসে গিয়েছিল। সময় ? বাইশ ঘণ্টা। ছয় ঘণ্টা হুশ ছিল না—এভাবে চলবে না। যা করার—চিহ্ন বানানো, কি রেডিওর কোনো ব্যাবস্থা করা, সব এক্ষুনি করতে হবে। এরপর ক্রমান্বয়ে শারীরিক পরিশ্রম করার, কিম্বা শুধু মাত্র চিন্তা করার ক্ষমতা ও কমে আসবে।

আমার রেডিও প্রেরকযন্ত্রের শক্তি কম, তা দিয়ে কি করা যায় ? হ্যাঁ, হয়েছে—রেডিওর সংকেতটা সূর্য্যের দিকে ফোকাস করা দরকার। একটা ডাইরেকশানাল এরিয়াল খাটাতে হবে। যার সাহায্যে অল্পজোরী রেডিওর সংকেতকে ফোকাস করে রেডিওকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। গডার্ড যখন ঠিক আমার উত্তরদিকে থাকবে তখন সূর্য্যের চিৎকার আর আমার সংকেত ওদের কাছে পৌঁছবে বিপরীত দিক থেকে। কোনো এরিয়াল ডলফাসের দিকে ফেরানো থাকবেই, এবং তাইতে আমার সংকেত ধরা পড়ার বেশ সম্ভবনা আছে। তারপর ডপলার এফেক্ট ব্যবহার করে আমি কোথায় আছি তাও জানতে পারবে।

কিন্তু ওই ডাইরেকশানাল এরিয়াল কোথায় মিলবে? বানাতে হবে। তার চাই। তার? স্পেসস্যুটের বাইরে তো কোন তার নেই। কি হবে? এই শেষ সুযোগ, এটা হারালে এরপর আর কোনো আশা নেই। তার নেই তো যে কোনো রকমের তামা? তাও নেই। তবে এ্যালুমিনিয়াম? আছে, ফার্স্ট এইড বাক্সটা এ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে তৈরী। পাত থেকে তার পাব কি করে? সে তো বিরাট সমস্যা। হতে পারে—প্লাসমাটর্চ দিয়ে। ধাতু কাটার জন্যই একটা ছোট প্লাসমা টর্চ আছে সঙ্গে,, তা দিয়ে পাত কেটে এ্যালুমিনিয়ামের ফালি পাওয়া যেতে পারে।

এরিয়াল হলো—ফার্স্ট এইড বক্সের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে এ্যালুমিনিয়ামের ফালি গুলো জোড়া হলো ক্যামেরার ফোল্ডিং ষ্ট্যাণ্ডের প্লাষ্টিকের পায়ার উপর। তারপর আরো শক্ত কাজ এই এরিয়ালকে আমার স্পেস স্যুটের হেলমেটের রেডিওর সঙ্গে জেড়ো লাগানো। আয়না থাকলে হতো—নিজের মাথায় পিছনে তার জোড়া লাগানো কি সোজা কথা? দু-ঘণ্টার উপর লেগে গেল।

আমার মেওয়াদ আর সতেরো ঘণ্টা। গডার্ড সম্ভবতঃ বুধের এক লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে এসে গেছে। এতো কোটি কিলোমিটারের পর পৌঁছে গিয়েছে বলা চলে। তবে এই এরিয়াল নিয়েও আমার রেডিওর পাল্লা পাঁচশো কিলোমিটারের বিন্দুমাত্র বেশী নয়। ঠিক কাজ করবে কিনা তাও জানি না।

—"সোম কলিং গডার্ড·····সোম কলিং গডার্ড·····সোম কলিং গডার্ড"·····প্রেরকযন্ত্র কাজ করছে। তবে সংকেত এরিয়ালে যাচ্ছে কিনা, এবং এরিয়াল তাকে ফোকাস করছে কিনা, তা জানবার কোনো উপায় নেই।

—"সোম কলিং গডার্ড ·····সোম কলিং গডার্ড"·····

ভাগ্যিস এরিয়ালটা তখন বানিয়েছি, এখন হলে আর জোর থাকতো না—হাত নাড়তেই কেমন একটু ব্যথা লাগে। ঘুম পাচ্ছে, গডার্ডে পৌঁছতে পারলে ঘুমোবো, কেবল ঘুমাবো। পৃথিবীতে আমার খবর পেয়ে গেছে এতদিনে, কিন্তু আমি পৃথিবী ফেরা অবধি ঘুমাবো।

—"সোম কলিং গডার্ড·····সোম কলিং গডার্ড"·····

আমার সঙ্গে কারুর যোগাযোগ নেই, কিন্তু এখন বুধ আর পৃথিবী ঠিক সূর্য্যের উল্টোদিকে নয়—ভিক্টর ডলফাসের সঙ্গে জ্যানস্কীর যোগাযোগ স্থাপন করেছে বলে মনে হয়। হয়তো আমার নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়েই এখন পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে। তাহলে গডার্ড আমাকে খুঁজে বের করার বিশেষ চেষ্টা করবে।

—"সোম কলিং গডার্ড·····সোম কলিং গডার্ড"·····

গডার্ডের যদি আসতে দশ ঘণ্টা দেরী হয়? তিন সপ্তাহের যাত্রায় দশ ঘণ্টার দেরী হতেই পারে। বেশী আগে পৌছবে না, কিন্তু দেরী হবার হাজার কারণ থাকতে পারে। যদি না পৌছয়? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। কারণ গডার্ডের সঙ্গে আমি ডলফাসে থাকা অবধি কোনো যোগযোগ হয় নি। গডার্ডের কখন আসার কথা তাই জানি। কখন আসবে তা জানি না।

—"সোম কলিং গডার্ড।"·····

আমাকে বলে যেতে হবে। আর কিছু করার নেই। সময় কাটাবার জন্য আকাশের তারা দেখছি। চেনা মুখ সব—ওই ক্যানোপাস্····· উল্টো দিকে আরো উজ্জ্বল সিরিয়াস্, আলফা সেণ্টরি—বেশী দক্ষিণে, ইওরোপ থেকে দেখা যেত না বলে আলাদা গ্রীক নাম হয় নি ···দিগন্তের কাছে কাল পুরুষের ঠ্যাং দুটো উঠে রয়েছে, কোমরের উপর থেকে আর দেখা যায় না·····

—"সোম কলিং গডার্ড·····সোম কলিং গডার্ড"·····

ঘণ্টাচারেক হলো ডেকে যাচ্ছি। হতাশার কারণ নেই। কিন্তু এরিয়ালটা তৈরী করে যে উৎসাহ এসেছিল তা শেষ হয়ে এসেছে। আট ঘণ্টা, শুধু আট ঘণ্টা।····· গডার্ডের পৌছে যাওয়া উচিত, হয়তো এক্ষুণি আমার মাথার উপর·····

—"সোম কলিং গডার্ড"·····

নানান চিন্তা·····একই চিন্তা ঘুরে ফিরে আসছে—রেজা, ওয়াং····· প্রোমেথিউস্·····

—"সোম কলিং গডার্ড"·····

বুঝতে পারছি অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হয় আর মানসিক যন্ত্রণা সয়ে লাভ কি? আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস বন্ধ না হতে দিয়ে এক টানে হেলমেটটা খুলে ফেলি। পাগলামি……

—"সোম কলিং গডার্ড ……সোম কলিং গডার্ড"……

আর নড়াচড়া করছি না। আর কত মিনিট বেশী টিকবে আমার অক্সিজেনের স্টক। সময় নেই…বেশীক্ষণ এক চিন্তা করতে পারছি না…… মনে সর্বগ্রাসী এক ভয়……অক্সিজেন মিটারের কাঁটাটা জল্লাদের মতো এগিয়ে আসছে……

—"সোম কলিং গডার্ড"……

গডার্ড করছে কি?……আমার এরিয়াল খারাপ?……পাঁচ ঘণ্টা…

—"সোম কলিং গডার্ড"……

মৃত্যুর আগে স্মৃতি গুলো সব শ্লো মোশানে মনের স্ক্রীনে দেখা যায়… সময় তো একটু আছে, তবু এতো চিন্ত ঘুরেছে কেন?…চাঁদ…শিহারী-কোটা…শঙ্করের সঙ্গে পাঞ্জাবে হাইকিং করেছি, তার থেকেই তিনশো কিলোমিটার হাঁটার দুর্বুদ্ধি হলো…কলকাতা…বন্ধুদের কথা, শর্মিলার কথা …অনেক কথা…মা, তুমি কোথায়…বাবা আমার বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে…শর্মিলা সুইসাইড করেছে…বন্ধু নিখোঁজ। আমার উপরে সূর্য্যের রাগ…প্রোজেক্ট ভালকানের নেতা আমি। আমি এসেছি সূর্য্যের আগুন কেড়ে নিয়ে মানুষের হাতে দিতে…আমি প্রোমেথিউস্…

এসব কি ভারছি? না এই মুহূর্ত্তে আর মনকে শাসন করে লাভ কি?… যা ভাবনা আসে ভেবে নিই…চিন্তার স্বাধীনতা…

—"সোম কলিং গডার্ড"……

…কিছু চিন্তা করতেও ভালো লাগছে না হয়তো গডার্ড রওনাই হয় নি, পৃথিবী থেকে আমাদের উদ্ধার করা সম্ভব নয় জেনে ভাওতা দিয়েছে…… তিন ঘণ্টা…হয়তো গডার্ড পথে ধ্বংস হয়ে গেছে……

"সোম কলিং গডার্ড"…

আর দু ঘণ্টা! এ জীবন শেষ হয়ে এলো! সাইনাস্ প্রোমেথেই এর রুক্ষ প্রান্তরে রচিত সুরজিৎ সোমের সমাধিস্থল…কিন্তু ওটা কি? ওটা কি চকচক করে উঠলো? দৃষ্টিভ্রম? গডার্ড?…নাকি জিউসের আগুনের রথ নেমে আসছে প্রোমেথিউসের শেষ জবানবন্দী নিতে?

———

বিবর্তনের বহু বছর পর……চল্লিশ বছরের শরীর…… ভাসমান মস্তিষ্ক !……ফিউচারিস্‌টিক গল্প।

শরীরটা মিলিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের মত !

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

কি আশ্চর্য্য ! এতো তাড়াতাড়ি আমি অনেক কিছু ভুলে গেলুম কি করে ? যতদূর মনে পড়ে কিংবা যতদূর জানি বলে মনে পড়ছে আমার; গত চল্লিশ বছর আমি আমার এই শরীরটাকে ব্যবহার করে যাচ্ছি। কিন্তু এই শরীরটা হঠাৎ যেন আজ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে !

আমার হাত, পা ? কোথায় গেলো ওগুলো ? আর ওগুলো যখন ছিলো আমার কাছে—কি করতুম আমি ওগুলোকে নিয়ে ? আমার অস্পষ্ট হাত-পাগুলোকে ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি কয়েকটি সংকেত পাঠালুম, কিন্তু কিছু হোলো না। মনে হোলো আমি যেন শূন্যে চিৎকার করে উঠলুম।

চিৎকার ? হ্যাঁ, চিৎকার করারই চেষ্টা করলুম। ওরা হয়ত শুনতে পেলো আমার চিৎকার, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পেলুম না। অসম্ভব এক নিস্তব্ধতা আমাকে যেন গ্রাস করে বসলো : কোনো শব্দের বিন্দুমাত্র ধারণাও আমার কাছে পৌঁছলো না। অদ্ভুত একটা শব্দ আমার বেশ চেনা-চেনা মনে হয়। শব্দটার নাম 'গান'। কিন্তু শব্দটার মানে কি ?

মাঝে মাঝে, অন্ধকার থেকে অনেকগুলো শব্দ সার বেঁধে আসে। দাঁড়ায় আমার সামনে। আমি ওদের চেনবার চেষ্টা করি—কিন্তু চিনতে পারি না। এক এক করে ওরা তেমনি সার বেঁধে চলে যায়। একটু হতাশ হয়ে।

আরে ! তুমি কখন এলে ? কি নিঃশব্দে এতটুকু আওয়াজ না করে তুমি আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ো অথচ আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও টের পাই না তুমি কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ছো !

আমি জানি তুমি অনেকটা আমার বন্ধুর মতো। আমার জন্যে তুমি যা করেছো—সে জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তুমি কে? আমি জানি তুমি মানুষ নও—কোনো মানুষী-বিজ্ঞান আমাকে আর তার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাবে না। দেখছো আমার কেমন কৌতূহল জাগছে? সাইনটা ভালো—না? ব্যথাটা যেন আর নেই—আমি যেন বেশ চিন্তা করতে পারছি এখন।

ইয়েস—আই এ্যাম রেডি। কি জানতে চাও?

আমার নাম কৌশিক সেনগুপ্ত। আমি নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রের পাইলট। গ্যালাকটিক সার্ভে কোম্পানীতে আছি বেশ কয়েক বছর। আমার জন্ম হয়েছিলো ২০৯৫ সালের ২১ আগষ্ট। পোর্ট ভাবা, মার্স-এর একটা জায়গায়। আমার বউ আর তিন বাচ্চা থাকে মেনকায়। আমি বই-টইও লিখি মাঝে মাঝে।……'চন্দ্রালোকে হযবরল' বেশ বিক্রি হয়েছিলো কয়েক বছর।…

তারপর কি হোলো? সে তুমিও যতটা জানো, আমিও ততটা জানি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র থেকে রকেট নিয়ে বেরোতেই আমি ধাক্কা খেলুম ল্যুনার কার্গোশিপের সঙ্গে। হাতে এক মুহূর্ত্ত সময় পেলুম না—কে যেন রকেট থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দিলো মহাশূন্যে। চোখের সামনে রকেটটা কেমন যেন লাল গনগনে হয়ে উঠলো। আর কি ভয়ানক গরম!

কিন্তু মহাশূন্যে কে যেন আমাকে লুফে নিলো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কে? কে আমাকে বাঁচালো অমন করে?

আচ্ছা, বলো আমার শরীরের কোন কোন অংশগুলো নেই? আমার হাত-পাগুলো কোথায়? না না আমি নার্ভাস হবো না সত্যি কথা শুনলে। যদি তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও তাহলে আমাদের পাড়ার বায়োটেকনিশিয়ান আমাকে নূতন এক জোড়া হাত-পা দিয়ে দেবে ঠিক। এর আগেও একবার দিয়েছিলো।

য়্যাঁ! তুমি জানো না আমাকে কেমন দেখতে? কি অদ্ভুত কথা! তাহলে কি আমার মাথাটাও নেই? মস্তিষ্ক?

আমি খুব দুঃখিত। একটু দেরী হোলো বোধহয়?

একটু ঠিক হয়ে নিই আগে। আমার নাম গুপ্ত সেন কৌশিক। জন্ম ১৮৯৫ সালে। মার্সে। পোর্ট ইণ্ডিয়ায়। আমার একটি—না, দুটি ছেলে… প্লিজ, একটু আস্তে আস্তে প্রশ্ন করুন। আমার ট্রেনিংটা আবার…

না, না, আমি মারা যাই নি। আমি জানি আমি কে। এমন কি আমি এও জানি আমি কি।

আমি হচ্ছি একটি, একটি রেকরডিং। একটা স্টোরেজের মধ্যে আছি

আপাততঃ। আমার আত্মা কিংবা মন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এক সময় ভাসমান মস্তিষ্কের মধ্যে আমার স্মৃতিগুলোকে টেপ কিংবা ক্রিষ্টালের মধ্যে রাখা হয়েছিলো—এখন আমিও ভাসমান মস্তিষ্কের মধ্যে...

তারপর কি হোলো ?

আর একবার কথাটা বলুন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনি···হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ওটাও করতে পারি—এখনই···কিন্তু ওটার কি যেন একটা নাম ? ···হ্যাঁ···পুনর্জন্ম !

বেশ এবার তাহলে আমার পরিকল্পনাটা শুনুন। আমার চিন্তাগুলোকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন···

আচ্ছা, গোড়া থেকেই বলছি।

এই যে মাথা...একটু ডিমের মতো। ওপর দিকটা চুলে ভরা। আমার আগে না—নীল চুল ছিলো।

এই যে চোখ। এইটাই সবচেয়ে দরকারি। অন্যান্য জীবের চোখ তো আপনি দেখেছেন ?

এই যে মুখ। অদ্ভুত ব্যাপার। দাড়ি কামাবার সময় এটা তো আমি হাজার বার দেখেছি। কিন্তু এখন—

না অতোটা গোল নয়—একটু সরু। আর ঠিক আগের মতো নেই—মুখের সঙ্গে লম্বালম্বি লাগানো আছে। চোখ আর ঠোঁটের সঙ্গে এটা...এটা···

কি আশ্চর্য্য, কিছুতেই মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, এটার নাম নাক। আর একটা কথা—কি যেন, ঠিক মনে পড়ছে না। কেন জানেন ? আমার মাথার কাজটা এখনো পুরো হয়নি। জানেন, আজ বিশ বছর ধরে আমি আমার শরীরটা জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছি ? কিন্তু কোথায় কোনটা লাগাবো তা এখনো মনে করতে পারছি না। একটু একটু মনে পড়ছে...

মাথা—অর্ধ গোলার্ধ। তারপর···মাঝখানে, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তলপেট, তলপেট থেকে দুটো উরু। দুটো উরু থেকে তলপেট। তলপেট থেকে...

যাঃ, সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আমার নাম··· আমার নাম...

মা, মা তুমি কোথায় ?

মা, মা, মা, মা.....

 ৩২ পাতার পর

অসংখ্য, বলা চলে—শত শত মৃতদেহ চোখে পড়েছে আমাদের এই অভিযানে।

অতিমাত্রায় বিস্মিত এবং ভীতিবিমর্ষ মন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে এইমাত্র আমি সংকিত হয়ে উঠছি। আমাদের সামনেই আন্দিজের ভয়াবহ ধূসর-নীল পাষাণ দেয়ালের রুক্ষ উচ্চতা ভীতপূর্ণ নয়নে প্রত্যক্ষ করছি। ফ্রল এবং আন্দ্রেই কিন্তু একেবারেই নির্বিকার। চন্দ্র এবং মঙ্গলগ্রহের খাড়া রুক্ষ সুউচ্চ পর্বতগুলোয় আরোহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এদের দুজনের। ফ্রল তাঁর কল্টিনেন্টাল ৬০০ বন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখছেন। এবং আন্দ্রেই নাইট্রো এক্সপ্রেস কার্টিজগুলো যথাস্থানে ভরে রাখছেন।

আন্দ্রেই তাঁর পায়ে স্যাকশন প্যাড লাগাচ্ছেন। ফ্রল তাঁর হাতে প্রপলায়ড লাগিয়ে নিচ্ছেন। আমি সিবাষ্টিয়ান পুরতো, ব্রেজিলের মাটোগ্রোসো ইভনিং-এর সংবাদদাতা, ধূর্ত্ত এক নারী প্রেমিক কিন্তু অতি মাত্রায় বোকা, ফুলের মতন কোমলমনা কিন্তু ভয়ঙ্কর কর্তব্য কঠোর ও বন্য দুঃসাহসী—পরমাণু যুগের এই ভয়ঙ্কর রাইফেল দুটোর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। যে কোন মুহূর্তে মংগলের ও দৈত্য বাদুড়টা আমাদের উপরে হানা দিতে পারে! যে কোন মুহূর্তে আমাদের তার তীক্ষ্ম ধারালো নখর সজ্জিত ডানায় আঘাতে ধরাশায়ী করে ফেলে আমাদের সব রক্ত শুষে নিয়ে আকাশের কোন সুদূরতম প্রান্তে কোটোপাক্সির চূড়োয় গিয়ে বসে থাকতে পারে।

এইমাত্র একটা ইউ এস 'ফক্সফার ২১' পরমাণু জেটকে উড়ে যেতে দেখলাম আন্দিজের উপর দিয়ে। এর অর্থ কী? সামরিক জুন্টা বা চায়না মার্কিন বাহিনী কী তাই চায়? মার্কিন বাহিনী কী ফ্রল এবং আন্দ্রেইকে সতর্ক করবার জন্যে—নাকি ভয় দেখাবার জন্যে গায়নার পারামারিবুর নৌঘাঁটি থেকে এইসব নিউট্রন বোমাবহনকারী ফক্সফায়ার ২১ কোটোপাক্সির দিকে পাঠাচ্ছে।

বলা চলে, এসব হচ্ছে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের জঘন্য প্ররোচনা, আমি সিবাষ্টিয়ান পুরতো—আন্দিজের ধূসর-নীল সুউচ্চ পাষাণের দেয়ালের একটা ফোঁকড় থেকে বেতারে কথা বলছি। ইউ এস ফক্সফায়ার ২১ যদি এমনি

জ্বালাতন শুরু করে তাহলে হয়তো জুণ্টার অনুরোধ সোভিয়েট কন্টিনেন্টাল ব্যালেষ্টিক মিশাইলগুলো পারামারিবুর 'মেয়েলি টলটলে সমুদ্রের জলের' উপরে নেমে আসতেও পারে, তখন এটা হবে মংগলের ঐ ভয়ানক রক্ত চোষা দৈত্যের কাণ্ডকাহিনীর চেয়েও ভয়ঙ্কর। এবং আমি সখেদে বলবো, মংগলের ঐ দৈত্যটা এতে আনন্দে হাততালি দিয়েই উঠবে।

কিন্তু আমরা চাইনা, যে পেরু এবং ইকুয়েডর পাতালের কুশ্রী রসাতলে তলিয়ে যাক।···এখন বেলা ১১ টা ২০ মিনিট। আমরা সাত হাজার ফিট উচ্চতায় উঠে এসেছি। মিঃ ফ্রল একটু আগে বলেছিলেন যে, তাঁর যেন কেমন বমি বমি বোধ হচ্ছে। শরীরটা মাঝে মাঝে ঝাঁকিয়ে উঠছে। আমি জানি এটা হচ্ছে আন্দিজের এক পাহাড়ে স্নায়ু দুর্বলতা। আমাজোনিয়া প্রথায় একে বলে 'সোরোচি'। কিন্তু দুপুরের পরে ফ্রল-এর দেহ থেকে এ রোগ বা 'সোরোচি' হয়ে গেল। আমরা ন' হাজার ফিট উপরে উঠে এসেছি। অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ এবং সন্দিগ্ধমনা বলে আমায় প্রণয়িনীরা আমাকে যে গাল দিত, এখন এই মুহূর্ত্তে, তাদের এখানে পেলে নিশ্চয়ই তাদের সংগে তর্কযুদ্ধে মেতে উঠতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার সমুখে যে হতবুদ্ধিকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি তা যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি নিষ্ঠুর···তা যেমনি লোমহর্ষক তেমনি অতিপ্রাকৃত এক দুঃস্বপ্নের মতন···তা যেমনি কঠোর বাস্তব তেমনি কাল্পনিক দুর্লব বিস্ময়ের মতন। আমি কি বলবো··· কিছু বলতে চাই···কিন্তু আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে ভয়ে ও ত্রাসে। সমস্ত পৃথিবীর বেতার শ্রোতারা—শুনুন আপনারা···

'আমি সিবাষ্টিয়ান পুরতো, 'মাটো গ্রোসো ইভনিং'এর অতি চালাক এবং ধূর্ত, নাকি অসমসাহসী এক সংবাদদাতা। আমি বলছি—কিছুক্ষণ আগে আমি অকস্মাৎ থেমে গিয়েছিলাম। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম আমি। প্রায় ষোলো হাজার ফিট উপরে, আন্দিজের মৃদু মৃদু তুষার আর কুয়াশায় ঢাকা ধূসরনীল গ্রানাইটের দেয়ালের একটা লম্বোদর পর্বতচূড়ার ঢালে দাঁড়িয়ে রয়েছিলাম আমরা। ফ্রল এবং আন্দ্রেই স্যাকশন প্যাড পায়ে আর প্রপলারড বাঁধা হাতে খাড়া দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলেন। আমি নীচের ঢাল থেকে দুরবীণ দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম তাঁদের। হঠাৎ দেখতে পেলাম অক্টেপোশের শুঁড়ের মতন বিশাল

আকৃতির একটা ডানাওয়ালা তীক্ষ্ম নখর সজ্জিত লোমশ বাহু...নেমে এল ওই লম্বোদর পর্বতচূড়াটাকে বেষ্টন করে! তারপর...

ওই ডানাওয়ালা শুঁড়টা লম্বায় অন্ততঃ চল্লিশ ফুট তো হবেই! কী শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিস্থিতি অভিযাত্রীদলের সমুখে এখন! আমার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, ও দানবটার কালো কুশ্রী বিশাল ডানাটা নেমে আসছে ফ্রল রোডিন ও আন্দ্রের দিকে। কিন্তু মনে হল, ফ্রল একটুও ভড়কায়নি। তাঁর কন্টিনেন্টাল ৬০০ রাইফেল এবার প্রপলারড হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রয়েছে।

আমি ব্রেজিলের মালভূমির এক সাধারণ মানুষ। 'মাটো গ্রোসো' মানেই হল মালভূমি। বিশ্বাস করুন, আমি পাথরের খাঁজ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি। হয়তো ভয়ে আর আতঙ্কে। তবুও আমি দূরবীণে সব লক্ষ্য রাখছি।

আমি শিউরে উঠলাম যখন দেখলাম, দুটি বিশাল শুঁড়ডানা ঝাঁপটে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা নীল আগুনের হলকা পাথরের দেওয়ালের একটা অংশকে ঝলসে দিল। মঙ্গলের ওই ভয়ানক রক্ত-দানবটা কী তাহলে একটা রেডিও-অ্যাকটিভ-শরীরী প্রাণী?

একটা অলুক্ষণে হিংস্র হুঙ্কার শুনতে পেলাম। সমস্ত আন্দিজের উপর দিয়ে সেটা একটা কুহেলিকাময় প্রতিধ্বনির মতন ভেসে ভেসে একসময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরবীণে দেখলাম, আন্দ্রেই পুড়ে ঝলসে গেছে। তাঁর প্রাণহীন দেহটা দেয়ালের খাঁজ থেকে একসময়ে নীচের পাষাণের জমাট তুষারের উপরে আছড়ে পড়লো।

আমি জানি এতদূর থেকে আমার চীৎকার শুনতে পাবেন না, তবুও চেঁচিয়ে উঠলাম, মিঃ রোডিন—মিঃ রোডিন! পালিয়ে আসুন—!

ভীত চকিৎ নেত্রে লক্ষ্য করলাম, ফ্রল তাঁর দেহটাকে সংহত করে নিয়ে স্যাকশন প্যাডের উপরে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বিশাল ভ্যাম্পায়ারটার একটা ডানা তাঁকে বেষ্টন করবার জন্যে দ্রুত নেমে আসছে। অত্যন্ত অসমসাহসী মানুষও এ দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে পড়বে।

আবার সেই হুঙ্কার! মঙ্গলের রুক্ষ পর্বতচূড়োগুলো যে হুঙ্কার শুনে

কেঁপে কেঁপে উঠতো, এখন পৃথিবীর মানুষ আমি, ব্রেজিলের এক ক্ষুদ্র ও বিশেষত্বহীন একটি মানুষ আমি, সেই হুঙ্কার শুনে আতঙ্কে হিম হয়ে যাচ্ছি। আবার কুহেলির এক অতীন্দ্রিয় ঐকতানের মতন সে হুঙ্কার আন্দিজের নীল পাষাণের ধূসরতায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফ্রল! মিঃ ফ্রল পালিয়ে আসুন! চেঁচিয়ে উঠলাম কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার গলা দিয়ে কোন স্বরই নিষ্ক্রান্ত হল না।

মহাকাশদৈত্যের সঙ্গে ফ্রলের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। এমন সংগ্রাম পৃথিবীর কোন মানুষ আজ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করেনি। বুঝলাম, ফ্রল রোডিন সবসময়ই শুঁড়ের ডানাগুলোর উপরে একটা লৌহদণ্ডের সাহায্যে কী যেন স্পর্শ করিয়ে দিচ্ছেন আর বিশাল প্রাণীটা সঙ্গে সঙ্গে ডানা গুটিয়ে নিচ্ছে। খুব সম্ভবতঃ ওটা একটা সীসের দণ্ড। মুখে সম্ভবতঃ হাইড্রোজেন কার্বন। মঙ্গলের জীবনের পক্ষে হয়তো ওটা একটা মারাত্মক কিছু।

লক্ষ্য করলাম, এইবার ফ্রল রোডিন একটা সুবিধে মতন স্থান নির্বাচন করে সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। আন্দ্রের মৃত্যুতে ফ্রল নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু শোক ভুলে প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় অক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে ঝুজতে লাগলেন তিনি।

পৃথিবীর মানুষ আমি 'সিব' পুরতো—জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর সংগ্রাম এই মুহূর্ত্তে চোখে পড়লো আমার। ভ্যাম্পায়ারটা এবার তার পৈশাচিক ভয়ঙ্কর উঁচু ঠোঁট-সমন্বিত কুৎসিত মুখটা (যে ঠোঁট দিয়ে সে রক্তচুষে নেয়) এগিয়ে দিল ফ্রলের দিকে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলবার জন্যে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ফ্রল রোডিনের কন্টিনেন্টাল ৬০০ রাইফেল থেকে প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ শুরু হলো। সে দৃশ্য অতুলনীয়, অদ্ভুত আর বিপুল বিস্ময়ে ভরা।

'৬০০ নাইট্রো এক্সপ্রেস কার্ট্রিজ' সবুজ আগুনের তরঙ্গ নিয়ে ছুটলো অতিকায় মঙ্গল বাদুড়টার দিকে। 'নাইট্রো এক্সপ্রেস কার্ট্রিজের' সে মারাত্মক শেল বর্ষণ প্রত্যক্ষ করে আমার নয়ন সার্থক হলো। আমার জীবন সার্থক হলো। ধন্য আমি! আমি দেখতে পাচ্ছি—মঙ্গলের ঐ হিংস্র বিশাল কালো দানবটা জ্বলেপুড়ে কয়েক সেকেণ্ডের ভেতরেই খানিকটা ভস্মস্তূপে পরিনত হলো যেন! আমি – আমি — বেতার শ্রোতারা— ধন্যবাদ আপনাদের—আমি—যেন মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে··· ফ্রল···ফ্রল... !

—

শব্দটা আসছে সম্ভবতঃ আমার ল্যাবরেটরি থেকেই।

নিউটন আজ ঘরেই শুয়েছিল—সেও দেখি শব্দটা শুনেই কান খাড়া করে সোজা হয়ে উঠে বসেছে। ওর হাব-ভাব দেখে আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর ওকে নিয়ে একতালায় রওনা দিলাম ল্যাবরেটরির উদ্দেশ্যে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শব্দটা আমার কানে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'শঙ্কু! শঙ্কু! শঙ্কু!'

আমার নামটা ধরে কে যেন বারবার চীৎকার করে যাচ্ছে। উচ্চারণ স্পষ্ট হলেও, স্বর কিন্তু একেবারেই মানুষের স্বর নয়; কিম্বা মানুষ হলেও, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে এমন কোন মানুষের মত নয়।

ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ঢুকতেই শব্দটা যেন চারগুণ বেড়ে গেল। আর নিউটনের সে কি প্রচণ্ড আস্ফালন। কোন রকমে তাকে বগলদাবা করে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের দিকে। শব্দটা আসছে আমার যন্ত্রটা থেকে—বলের দিক থেকে নয়।

আমি এসে দাঁড়াতেই চীৎকারটা থেমে গেল।

তারপর প্রায় আধ মিনিট সব চুপচাপ। আমার বগলের তলায় বুঝতে পারলাম নিউটন থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ আবার তীক্ষ্ণস্বরে সেই চীৎকার সুরু হল।

টেরাটম্! টেরাটম্! টেরাটম্ গ্রহ থেকে বলছি! কলির শঙ্কু! কলির শঙ্কু! তুমি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ?

আমি কি বলব? আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করাই যে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আবার প্রশ্ন এলো—'শঙ্কু', আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ? তোমার মাইক্রোসোনোগ্রাফ যে ওয়েভলেংথে রয়েছে সেই ওয়েভলেংথেই আমরা কথা বলছি। শুনতে পাচ্ছ ত 'হ্যাঁ' বল—আরো কথা আছে।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত বললাম, 'পাচ্ছি শুনতে। কি বলবে বল।'

উত্তর এলো, 'আমরা তোমার ঘরে বন্দী। বুঝতে পারছি, তুমি না জেনে এ কাজ করেছ। কিন্তু করে অন্যায় করেছ। আমরা সৌর জগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। কিন্তু তাতে তাচ্ছিল্য করার কোন কারণ নেই, পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ লক্ষগুণ বড় গ্রহও সৌরজগতের বাইরে রয়েছে। আমাদের শক্তি আমাদের আয়তনে নয়। আমাদের শক্তি আমাদের বিজ্ঞানে, আমাদের বুদ্ধিতে। তোমাদের পৃথিবীর যা সম্পদ সে অনুপাতে আমাদের টেরাটম গ্রহের সম্পদ লক্ষগুণে বেশি। আমরা কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। জলের মধ্যে পড়েছিলাম, তাই আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি, কারণ আমরা মাটির নিচে বাস করি। কিন্তু তোমার এই কাঁচের আচ্ছাদন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ অক্সিজেন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের যেমন এ জিনিষটা দরকার, তেমনি আমাদেরও। এমনিতে মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাৎ সামান্যই, তবে আমাদের বুদ্ধি অনেকগুণে বেশি, আর আয়তন আমাদের এতই ছোট যে তোমাদের সাধারণ মাইক্রস্কোপে আমাদের দেখা যাবে না।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামল। আমি যে এর মধ্যে কখন চেয়ারে বসে পড়েছি তা নিজেই টের পাইনি। তারপর আবার কথা শুরু হল।

'তোমার কাছে আমাদের অনুরোধ—কাঁচের আচ্ছাদন খুলে ফেলো। আমাদের আয়ু এমনিতেই কমে এসেছে! একটা আস্ত গ্রহের সমস্ত অধিবাসীদের হত্যা করার অপরাধের ভার কি তুমি সারা জীবন বইতে পারবে? তাই অনুরোধ করছি—আমাদের মুক্তি দাও। তুমি বৈজ্ঞানিক। আমাদের সম্বন্ধে তোমার মনে কোনরকম সহানুভূতির ভাব নেই?'

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল। এবারে সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ক্ষমতা আছে যাতে তোমরা তোমাদের চেয়ে আয়তনে অনেক বড় প্রাণীকেও হত্যা করতে পার?'

কিছুক্ষণ কোন উত্তর নেই। আমি আবার বললাম; 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। গত কদিনের মধ্যে তোমাদের কাছাকাছি কতগুলি

প্রাণীর যে মৃত্যু হয়েছে—তার জন্য কি তোমরা দায়ী ?

এবারে আমার প্রশ্নের উত্তরে একটা পাল্টা প্রশ্ন এলো—'ভাইরাস কাকে বলে জান ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কাকে বলে ?'

আমার ভারি অপমান বোধ হচ্ছিল, তাও উত্তর দিলাম—'রোগ-বহনকারি বিষাক্ত বীজকে বলে ভাইরাস।'

'ঠিক। এই ভাইরাসের আয়তন কী ?'

'মাইক্রস্কোপে দেখতে হয় ;'

'ঠিক। কিন্তু এই বীজ থেকে একটা গোটা শহরের লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে সেটা জান ?'

'শুধু শহর কেন ? একটা সম্পূর্ণ দেশের লোক সংখ্যা লোপ পেয়ে যেতে পারে। মহামারীর কথা কে না জানে ?'

'ঠিক। এখনও কি বুঝতে পারছ না আমাদের ক্ষমতা কোথায় ?'

'তোমরা কি ভাইরাস ছড়িয়ে দাও ?'

'ছড়িয়ে দেবো কেন ?'

'তাহলে ?'

কোন উত্তর নেই। আমি অনুভব করলাম আমার ভেতরের জামাটা ঘামে ভিজে উঠেছে। একটা সাংঘাতিক সন্দেহ মনের মধ্যে জেগে উঠছে।

এই গ্রহের অধিবাসীরা কি তাহলে এক একটি মূর্তিমান ভাইরাস ?

তাই যদি হয়, তাহলে এদের মুক্তি দিলে ত এরা সমস্ত পৃথিবীকে —'তিন মাসের মধ্যে।'

আমি চমকে উঠলাম। আমার কোন্ প্রশ্নের জবাব এরা দিচ্ছে ? আমি ত কোন প্রশ্ন করিনি এদের।

এবারে একটা ক্ষীণ হাসির শব্দ পেলাম—সে হাসি এক অপার্থিব বিদ্রূপে ভরা। তারপর কথা এলো—

'আমরা মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তুমি' ভাবছ সমস্ত পৃথিবীকে রোগাচ্ছন্ন করার শক্তি আছে কিনা আমাদের।

আমি উত্তরে বলছি—আছে। শুধু তাই নয়—সমস্ত পৃথিবীকে তিন মাসের মধ্যে আমরা জনশূন্য করে দিতে পারি। সংক্রামক রোগের জন্য ত আর হাঙ্গাম করতে হয় না! আমাদের একজনের চেষ্টাতেই সমস্ত গিরিডি শহরটা ফাঁক করে দিতে পারি। আর সকলে মিলে যদি একজোটে লাগি তাহলে···।'

গলার স্বরটা যেন কেমন ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেটা কি যন্ত্রের দোষ?

আবার উত্তর এলো—না, তোমার যন্ত্র ঠিক আছে। আমরাই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কাঁচের ঢাকনা না খুললে আমরা আর বাঁচব না। আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তুমি—প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু; এই খুনের জন্য অবিশ্যি তোমাকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু বিবেক বলে কি তোমার কিছুই নেই! একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কি এতটা নিষ্ঠুরতা সম্ভব? ভেবে দেখ শঙ্কু, ভেবে দেখো।'

'তোমাদের যদি মুক্তি দিই, তাহলে পৃথিবীর মানুষের উপর থেকে তোমাদের আক্রোশ যাবে কি? তোমাদের বিশ্বাস করব কী করে?

এ প্রশ্নের জবাব এলো না। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর আমার যন্ত্রের ভিতর থেকে আসতে আরম্ভ করল এক বীভৎস আর্তনাদের কোরাস। কত কণ্ঠ সে কোরাসে মিলেছে জানি না। কিন্তু সেটা যে আর্তনাদ, এবং তাতে যে তীব্র যন্ত্রণার ইঙ্গিত রয়েছে তাতে কোন ভুল নেই।

'শঙ্কু! শঙ্কু!

সমস্ত আর্তনাদ ছাপিয়ে আবার সেই কথা।

'শঙ্কু! শঙ্কু! শঙ্কু!'

'কী বলছ?'

'কাঁচের ঢাকনা খুলে দাও, খুলে দাও! আমরা মরতে চলেছি। আমাদের প্রাণ তোমার হাতে। হত্যার দায়ে পোড় না। সারাটা জীবন বিবেকের জ্বালা...'

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এলো।

আমি যেমন চেয়ারে বসেছিলাম, তেমনই বসে রইলাম। একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও

আমার কর্তব্য কী সেটা বুঝতে পারছিলাম। কাঁচের ঢাকনা খোলা চলে না। টেরাটম গ্রহের প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের জীবন বিপন্ন করা চলে না।

আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফে শব্দ কমে আসছে। কথা থেমে গেছে—এখন কেবল তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

সে আর্তনাদ ক্রমশ হাহাকারে পরিণত হল।

তারপর সে হাহাকারও মিলিয়ে গিয়ে রইল এক গভীর নিস্তব্ধতা।

আমি আরো মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আমার যন্ত্রের সুইচটা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে বলটার কাছে হেঁটে গিয়ে কাঁচের ঢাকনাটা তুলে ফেললাম।

ঘড়িতে ভোর পাঁচটার ঘণ্টা বাজছে।

কিন্তু টেরাটমে বসন্তের রং ধরেনি। তার বদলে একটা যেন মেটে রুক্ষতা।

আমি বলটাকে তুলে নিয়ে নিউটনের দিকে চাইলাম। সে-ও দেখি এক দৃষ্টে বলটার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু আগের সেই আক্রোশের কোন ইঙ্গিত পেলাম না তার দৃষ্টিতে। আমি বললাম, তুই খেলবি বলটাকে নিয়ে? নে খেল।'

বলটা মাটিতে রাখতে নিউটন এগিয়ে এলো। তারপর তার ডান হাত দিয়ে মৃদু একটা আঘাত করতেই সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ ফেটে চৌচির হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

———

দোতলা রাস্তা : ।। বিজ্ঞান সংবাদ ।।

জার্মানীর জাতীয় সড়কগুলির জন্য শয়ে শয়ে কিলোমিটার প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড্ দোতলা রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা হচ্ছে। খরচ বেশী নয়, আর এতে জমি কেনার খরচা বাঁচবে, চাষের ও ক্ষতি হবে না। আবার কোনো রাস্তার প্রয়োজনীয়তা কমে গেলে সহজেই তাকে খুলে ফেলে অন্যত্র চালান করা যাবে। রেল লাইনের ওপর দিয়েও এরকম রাস্তা বানানো চলে।

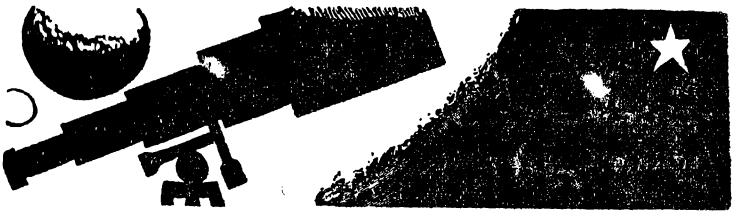

ফ্রাঙ্ক লিলি পোলক রচিত 'দি লাস্ট ডন' অবলম্বনে রচিত একটা ভয়ানক গল্প....

সেদিন ভয়ঙ্কর

শ্রীধর সেনাপতি

[বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে জনৈক বিজ্ঞানী বলেছিলেন: তিনি নিজে বিশ্বাস করেন না যে জগৎ সংসার অসীম, অপার! ' যেখানেই হোক, এ ব্রহ্মাণ্ডের একটা কেন্দ্রস্থল আছে এবং ব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হচ্ছে সেই স্থানটির ওপর নির্ভর করেই। চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। সূর্যকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে গ্রহজগৎ। সৌরজগৎ কোন একটি স্থির নক্ষত্রকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এবং সমস্ত রীতিটা নিজে নিঃসন্দেহে কতকগুলো দূর বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরেই চলেছে। কিন্তু এই ধরনের প্রবর্ধন কোথা না কোথাও রুদ্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। যেতে বাধ্য।

তা'হলে একটা সুবিপুল গন্‌গনে মধ্যসূর্য মহাকাশের কোথা না কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে রয়েছে। সূর্যটি তার উপগ্রহ অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ এবং ততোধিক উত্তপ্ত! ওই সূর্যটি একদিন পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি-গোচর হবে। কিন্তু পৃথিবীতে সূর্যটির রশ্মি এখনো এসে পৌঁছতে পারেনি।]

মাসটা ফেব্রুয়ারী। আবহাওয়া বেশ কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ।

'ও আলোটা কীসের, ডঃ বাসু?' অনীতা উত্তেজিত হয়ে বলল।

'চাঁদ উঠছে বোধ হয়।' ক্রমশঃ আলোকিত দিগন্তের দিকে তাকিয়ে

উত্তর দিলেন ডঃ বাসু। ওদের উভয়ের দৃষ্টিই স্থির হয়েছিল পূর্ব দিগন্তের পানে। ওরা নিঃশব্দে লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন—ধীরে ধীরে একটা সমুজ্জ্বল বিপুলাকার চাকৃতি যেন অঙ্কিত হয়ে গেল ওই আকাশপটে। এখন একটা পূর্ণচন্দ্রের মত মনে হল।

কিন্তু এমন চকচকে আলো তো চন্দ্রের কাছ থেকে তো পাওয়া যায় না।

'অনীতা দেবী, ওই—ওটাই সেই নতুন নক্ষত্র!'

'না। আমার মনে হয় ওটা চাঁদই!' অনীতা বিজ্ঞের মত বলল, 'এটা চাঁদ ওঠারই সময়, ডঃ বাসু। কী নরম আলো দেখছেন না? নতুন নক্ষত্র পৃথিবীর অন্য দিক থেকে উদয় হবে।'

ডঃ বাসু বললেন, 'সূর্য যেমন ওঠে, সেই একই ভাবে নতুন নক্ষত্রেরও উদয় হবে! আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠুক আবহাওয়াটা। তখন—

ঘরের আবহাওয়ার পরিবর্তন আগে থেকে অনুভব করেছিলেন ডঃ বাসু। এখন যে আরো কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠেছে, তা'ও উপলব্ধি করতে পারছেন। আরো কিছুক্ষণ কাটল প্রতীক্ষায়। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ হল না।

পথে পার্কে, বাড়ির জানালার ছাদে মানুষের ভীড় ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল। সকলের দৃষ্টি আকাশের দিকে।

'ওই—নিশ্চয়ই ওটা নতুন সূর্য।'

উজ্জ্বলতা ওর দ্রুত বেড়ে উঠছে।

'দেখুন, দেখুন, অনীতা দেবী। লাল হয়ে উঠছে ওটা। দিনের আলোর চেয়ে আরো বেশী উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর কী প্রচণ্ড উত্তাপ! উঃ!' উল্লাসের সঙ্গে কিছুটা বা আতঙ্কের ছোঁয়া ডঃ বাসুর কণ্ঠে!

সমস্ত পূর্ব আকাশ আলোয় আলোময়। চড়ুই পাখীর ঝাঁক কিচিরমিচির সুরু করে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে পূর্ব দিগন্ত হয়ে উঠল যেন এক জলন্ত চুল্লী! নিদারুণ আতঙ্কে অনীতা সহসা চীৎকার করে উঠল। সে দেখতে পেল, গঙ্গার

বুকে ভাসমান এক জাহাজের পতাকা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

আতঙ্কগ্রস্ত হাজার মানুষের বিমূঢ় চীৎকার ভেসে উঠল বাতাসের বুক চিরে! কোথাও যেন ভেঙে পড়ল কোন ভারী জিনিষ।

জানলার ভেতর দিয়ে নতুন সূর্যের রশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। মনে হয়, মুখের সামনে যেন আচম্‌কা ব্ল্যাষ্টফারনেসের আবরণী খুলে দিয়েছে কেউ।

মানমন্দিরের জানালা দরজার কাঁচ ভেঙে পড়ল।

সূর্যের মতই দেখতে, কিন্তু আকৃতিতে তার প্রায় পঞ্চাশ গুণ বড়। তেমনি সুতীব্র উজ্জ্বল রশ্মি! আকাশের বুকে নতুন সূর্যোদয়।

একটা লৌহনির্মিত যন্ত্র থেকে ধোঁয়া উঠতে সুরু করে দিল। পোড়া বার্নিশের গন্ধ এল নাকে।

'একী ব্যাপার। সর্বনাশ!' ডঃ বাসুও নিজেকে এবার স্থির রাখতে পারলেন না।

বাইরে থেকে ভীত সন্ত্রস্ত যন্ত্রণাকাতর লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর ধেয়ে আসতে লাগল ডঃ বাসুর কানে। মানুষ আজ কী অসহায়!

অনীতা যেন পাথর হয়ে গেছে!

দমকলের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন। বিভিন্ন দিক থেকে ধূম্ররাশি ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

ডঃ বাসুর কর্মচারীরা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল মানমন্দির থেকে। অনীতার একখানা হাত ডঃ বাসু কঠিন মুষ্টিতে চেপে ধরলেন, 'আসুন, আমরাও এ স্থান ত্যাগ করি। এখানে বোধ হয় সোজাসুজি আগুন লেগে যাবে।'

যেন যান্ত্রিক গলায় অনীতা উত্তর দিল, বাইরে আরো বিপদ ডঃ বাসু। মানুষের পায়ের নীচে পিষে মরে যাব তাহলে। তার চেয়ে নীচের ঘরে আশ্রয় নিইগে চলুন।' পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে অনীতার মুখখানা। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে মুছে নিয়েছে কেউ।

কয়েকটি সুরক্ষিত কক্ষ ছিল নীচের তলায়। মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সে কক্ষগুলিতে সংরক্ষিত থাকে। কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে সেখানে। ওপরতলা থেকে সিঁড়ি

দিয়ে কয়েক ধাপ মাত্র নীচের দিকে নেমেছিলেন ওরা, এমন সময়ে বাতাসে বিষণ্ণ শীতল ভাব অনুভব হল। সমস্ত আকাশ ভারী হয়ে উঠতে লাগল গাঢ় মসীবর্ণ মেঘের সুবিপুল সমাবেশ। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল। দ্বিতলে জানলার কাছে ওরা দু'জনে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিপাত করলেন বাইরের দিকে।

আকাশ এবং মাটির ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে একটা কৃষ্ণবর্ণ সুবিশাল পিণ্ডের মত বস্তু সম্মুখের সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে প্রচণ্ড দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছিল।

'একটা সাইক্লোন—সঙ্গে জলস্তম্ভ।' অস্ফুট স্বরে বললেন ডঃ বাসু। এমনি আচকা জলের অত্যধিক বাষ্পীভূত হওয়া এবং বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিণাম যে এমন হবে, ডঃ বাসুর মনে পূর্বাহ্নেই তা উদয় হয়েছিল।

দৈত্যাকার কালো স্তম্ভটি দুলে দুলে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে ভীম গর্জনে। দুর্ভেদ্য কুয়াশার এক প্রাচীর যেন অনুসরণ করছে ওটাকে। মুহূর্তের মধ্যে ডজনখানেক বিদ্যুতের তরবারি ঝলসিত হয়ে উঠল কালো শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে এক কর্ণবিদারী আওয়াজ শ্রুতিগোচর হল, নগরীর প্রতিরোধ ক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল বুঝি।

ডঃ বাসু চীৎকার করে বললেন, 'তাড়াতাড়ি—অনীতা দেবী, আমার মানমন্দির বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেল।'

ওরা উভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে নীচের দিকে নামতে লাগলেন।

সহরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিংস্র দৈত্যটা। তা তা থৈ থৈ নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। সব কিছুকে গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে যাবে ওটা। ধ্বংসের ডাক কানে আসছে ডঃ বাসুর।

প্রচণ্ডবেগে উষ্ণজলের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। তা থেকে বাষ্প উঠছে। বাড়ি ঘরের দেওয়াল পড়ছে ভেঙে ভেঙে।

ডঃ বাসুর মনে হল, নিষ্ঠুর হাতে কে যেন মানমন্দিরটাকে মুচড়ে দুমড়ে দেবার চেষ্টা করল একবার। কিন্তু বাড়িটার মজবুত ষ্টীলের কাঠামো এত ভঙ্গুর নয়। তবে বাড়িটা যেন একপাশে হেলে পড়েছে কিছুটা। এদিক ওদিকের দেওয়াল থেকে প্লাষ্টার, ইট, লোহা, কাঠ অবিন্যস্ত হয়ে গেছে, খসেও পড়েছে অনেক। ডঃ বাসু এবং অনীতা

এখানে বসে চারপাশের দৃশ্যই অবলোকন করতে সক্ষম এখন।...

মুখমণ্ডল থেকে জলকাদা পরিষ্কার করছিল অনীতা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, ওর শরীরে বিশেষ কোন আঘাত লাগেনি। তবু ডঃ বাসু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথাও লেগেছে নাকি অনীতা দেবী?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম, আমরা বোধ হয় মারা যাব।' একটা হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে থেকে যেন বলল অনীতা, 'এটা কী হয়ে গেল, ডঃ বাসু।'

'আমার মনে হয়, এখনো সবটা হয়নি। এই সুরু।' ডঃ বাসু চিন্তিত গলায় উত্তর দিলেন।

প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যায় পুঞ্জীভূত মেঘের দল অবিরাম গতিতে ছুটে আসছিল। বৃষ্টিপাত সুরু হল। অঝোর ধারায় ঠিক নয়—যেন কোন বাঁধভাঙা প্লাবনের জল নেমে এল আকাশ থেকে। কিন্তু সে জলেও শীতলতা নেই এতটুকুও। উষ্ণ জল থেকে বাষ্প নির্গত হয়ে পুনরায় মিশে যেতে লাগল হাওয়ায়।...

মিনিট তিনেকের মধ্যে উষ্ণ বাষ্প সমস্ত বিশ্বজগতের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ করে দিল। পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে সব কিছু বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে বিপুল জলরাশি ভীমগর্জনে দুর্ব্বারগতিতে দিক্‌বিদিক ধাবমান।...

ডঃ বাসুর দৃষ্টির সামনে ঝুলে রইল যেন এক কুয়াশার পর্দা। তারই ভেতর দিয়ে সর্বনাশা ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন উনি। উষ্ণ বাষ্পের চাপে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতরটা।

'উঃ—ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! আমি মরে যাব।' করুণ গলায় বলে উঠল অনীতা।

ডঃ বাসু অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন ওর আতঙ্কিত মুখের দিকে।

কটা ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যায় একইভাবে। প্রকৃতি সামান্য একটু শান্তরূপ ধারণ করে। আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ ছিন্নভিন্ন, খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে এখন।

সূর্যকে দেখতে পেলেন ডঃ বাসু। পৃথিবীর পুরোনো সূর্যটি।

আকারে ছোট – ভিজে-ভিজে !

কিন্তু উত্তাপের প্রচণ্ডতা এবং আলোর ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ করে সেই বিপুলাকার নক্ষত্র মেঘের অন্তরালে এখনো জ্বলজ্বল করছে।

বায়ুমণ্ডল দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পুনরায়। দুই সূর্যের দেহ থেকে একই সঙ্গে পৃথিবীর বুকে অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে। সে উত্তাপ সহ্য করার শক্তি মানুষের নেই।

কিন্তু ডঃ বাসু এবং অনীতাকে সেই জ্বালাধরানো রশ্মির হাত থেকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে মানমন্দিরের বিশেষভাবে নির্মিত একটি কক্ষ। কিন্তু আর কতক্ষণ তা সম্ভব হলে ?

অনীতার গলা দিয়ে একটা কাতরস্বর বেরুচ্ছে। শ্বাস নিতে নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করছে ও !

ডঃ বাসুর মস্তিষ্কের মধ্যেও নিষ্ঠুর হস্তে যেন কেউ হাতুড়ির আঘাত করছে ! ওঁর দৃষ্টিতে সামনে ভেসে উঠছে অদ্ভুত বিচিত্র দুঃস্বপ্নভরা অবাস্তব ছবি ! এভাবে বেঁচে থাকা আর সম্ভব নয়—ডঃ বাসুর মনে হল, তাইতো ! ঠিক কত ডিগ্রী উত্তাপে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে ? তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। সারাদেহ থেকে যেন ছালটা খসে যাচ্ছে ! প্রবল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সর্ব শরীর।

অবশেষে পশ্চিম দিগন্ত লাল হয়ে উঠল। অস্ত গেল নবোদিত সূর্যটি। আবহাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

অন্ধকার নেমে আসছে।

'আঃ ! এ সুখ এখন স্বর্গীয় মনে হচ্ছে !' দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বললেন ডঃ বাসু। অনুভব করলেন, জীবনটা যেন নতুন করে ফিরে পাচ্ছেন।

'কিন্তু এ সুখ কতক্ষণের জন্যে, ডঃ বাসু !' অন্ধকারে অনীতার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকমের শান্ত বলে মনে হল, 'কয়েক ঘণ্টা পরে নতুন সূর্য আবার উদিত হবে।'

'ইতিমধ্যে আমরা আরো নিরাপদ একটা স্থান সংগ্রহ করে নিতে পারি।'

'তাতে কোন লাভ হবে না। বুঝতে পারছেন না, ডঃ বাসু, নতুন সূর্যটা আবার উঠবে। আগুন ঝরবে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবী থেমে নেই—ঘুরছে ! উত্তাপের ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীটা হয়ে যাবে একটা পোড়া গোলক ! আপনি আর আমি ছাড়া আর কত মানুষ এখনো জীবিত আছে !'

'আছে, আছে। জীবিত আছে বৈকি!' সামান্য একটু চিন্তা করে বললেন ডঃ বাসু, 'মাটির নীচেই যারা আশ্রয় নিতে পেরেছে—'

—'জলের মধ্যে তারা ডুবে মরেছে, ডঃ বাসু। আর যদি সামান্য কিছু মানুষ বেঁচে থাকে এখনো, তবে দ্বিতীয় দিনে তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! এবার একটু চিন্তা করে দেখুন—কয়েক হাজার বছর ধরে এই অগ্নিস্রোত ধেয়ে আসছে আমাদের পৃথিবীর দিকে। বর্তমান যুগে জীবনকে কত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে তুলেছি আমরা। অথচ একথা আমরা জানতাম না যে, কোন মুহূর্ত আমরা পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে যেতে পারি। এটাই বোধহয় জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য, ডঃ বাসু।'

'তা' আমি স্বীকার করি না' জোরের সঙ্গে বললেন ডঃ বাসু, 'মনুষ্য জীবনের এটা শেষ হতে পারে। কিন্তু অন্য কোন আকারে জীবন পৃথিবীতে থাকবে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজাণু, যারা প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, পৃথিবীতে থাকবে তারাই। জীবনের বীজ যে কোন প্রকারে পৃথিবীর বুকে থেকে যাবেই। জীবনের বিবর্তন আবার সুরু হবে নতুন করে। পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী নতুন প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটবে পৃথিবীতে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যে কেমন প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণ করে, শুধু সেটুকু দেখে যাওয়ার ইচ্ছা আমার মনে জাগছে, অনীতা দেবী!'

পুনরায় বৃষ্টিপাত সুরু হল। আবার সেই একই ধরনের ঝড়ঝঞ্ঝা—উষ্ণতা—বাষ্প...দুলে উঠল পায়ের তলার মাটি!

পূর্বদিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

অনীতা দু'বাহু বাড়িয়ে ডঃ বাসুর গলা জড়িয়ে ধরল।

'ভয় পেয়ো না, অনীতা। সাহসের সঙ্গে অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে।'

'না, আমি আর ভয় পাচ্ছি না। এত আনন্দ, এত সুখ এর আগে আমি কোনদিন উপভোগ করিনি!'

ডঃ বাসুর বাহুবন্ধনে নিজেকে যেন নিঃশেষে সঁপে দিল অনীতা। ডঃ বাসুর মনে হল, উনি যেন বিধ্বস্ত পৃথিবীর কান্না শুনছেন।

'আমরা বেঁচে থাকব। একটুক্ষণের জন্যে মৃত্যুর বিভীষিকার কথা ভুলে যাব আমরা।' অনীতা ফিসফিস করে বলল ডঃ বাসুর কানের কাছে।...

পূর্বদিগন্ত তখন অলক্তকরাগে এমনি রঞ্জিত হয়ে হয়ে উঠছে—পৃথিবীর মানুষ যে দৃশ্য আর কোনদিন প্রত্যক্ষ করতে পারবে না!